প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬০

মূল্য দশ টাকা

ভারতীয় ফুটবল কোচিং-এর পথিকৃৎ
ঁদুঃখীরাম মজুমদার (স্যার)কে

কোচ হিসেবে পরিচিত ও বেলুড়ে 'সকার সেণ্টার' খোলার খবরটা দৈনিক পত্রিকায় বেরোবার পর থেকেই, কলকাতা ও গ্রাম বাঙলার যখন যেখানে গিয়েছি, বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছি—ফুটবল খেলা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। সবিনয় অনুরোধ এসেছে বিভিন্ন গ্রাম্য ক্লাব-কর্মকর্তাদের কাছ থেকে, অন্ততঃ স্বল্পকালীন তাদের মাঠে কোচিং ক্যাম্প খুলতে। তাদের মুখের ওপর না বলে দিতে পারিনি। চেষ্টা করব বলে পালিয়ে এসেছি।

বাঙলা ও বাঙলার বাইরের অনেক চিঠিতে আমার লেখার টেবিল ভর্তি, যার ভিতরের দাবী অত্যন্ত স্পষ্ট—খেলা শেখাবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। প্রত্যেককে নিরাশার কথা লিখতে আমার বেঁধেছে। চিঠিগুলো বাস্কেটে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে—আমার তরফ থেকে এদের জন্য কিছু করা যায় না!

তারই ফলশ্রুতি—'ফুটবল খেলতে হলে'।

আশ্চর্যের কথা, একশো বছরের ওপর ভারতে ফুটবল খেলা চালু হয়েছে, এবং নিঃসন্দেহে এ আজ এদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ফুটবল আমাদের জনগণমানসে কত-না বিচিত্র উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছে ও জোগাচ্ছে। কিন্তু যাদের ক্রীড়াদক্ষতা নিয়ে এত মাতামাতি ও হাতাহাতি, যাদের কৃতিত্বের ওপর এতবড় ঐতিহ্যশালী একটা দেশের মর্যাদা ও সম্মান নির্ভর করছে, তাদের সুদক্ষ ভাবে গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজনীয় চেষ্টাটা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে এদেশের গভর্মেণ্ট, স্পোর্টস কাউন্সেল ও ফুটবল সংস্থার কর্মকর্তারা।

জনপ্রিয়তা অথবা স্টেডিয়াম-ভর্তি দর্শকদের ওপর নয়—দক্ষ খেলোয়াড়দের সংখ্যা-হারের উপরই যে খেলার মান সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—এই সর্বদেশস্বীকৃত সত্যটি, বর্তমানের প্রায় সব ফুটবল প্রেমিকরাই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

পৃথিবী জুড়ে সব উন্নত দেশই আজ আপ্রাণ চেষ্টা করছে—শহরে, গ্রামে, স্কুলে, কলেজে উপযুক্ত কোচের সিধেসিধি তত্ত্বাবধানে খেলোয়াড়দের ছোট বয়স থেকেই তালিম দিতে—যাতে উত্তরজীবনে তারা সম্পূর্ণ ফুটবলার হয়ে—ফুটবলের ক্রমবর্ধমান জটিলতায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মানি, এই প্রথাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে যে বিরাট অঙ্কের টাকা তাঁরা খরচ করেন, তা আমাদের মত অনুন্নত, গরীব ও বাক্‌সর্বস্ব দেশের সাধ্য ও স্বপ্নের বাইরে। তাই ব্যক্তিক সাধ্যের ভিতর বর্তমানে যা বাস্তব-সম্ভব, তার কথা ভেবেই এই সংযোজন—'ফুটবল খেলতে হলে'।

পূর্বসূরী ভারতীয় লেখকের এই বিষয়ের উপর কোন প্রামাণ্য বই না থাকায় তথ্যের দিক থেকে আমায় সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছে আমার অভিজ্ঞতা ও বিদেশী বই, পত্র ও পত্রিকার ওপর। আর ভাষার দিক থেকে অনুভব করেছি—বাঙলা যথেষ্ট সৃষ্টিশীল হওয়া সত্ত্বেও তার স্পোর্টস-সাহিত্য আজও ভয়ানক দুর্বল। কাজেই এই দুই দিক থেকে, সমালোচকের নির্মম দৃষ্টিতে যদি এই বই নস্যাৎ হয়েও যায়—লেখক হিসেবে এইটুকু আমার সান্ত্বনা থাকবে যে, বাঙলা

ভাষায় বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবল খেলা শেখার বিষয়ে পথিকৃৎ বই হলো—'ফুটবল খেলতে হলে'।

যাঁর অনুপ্রেরণা ও নিয়ত সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এ বই কিছুতেই প্রকাশ সম্ভব হতো না, সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধু সাহিত্যিক মতি নন্দীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ বই লিখতে গিয়ে ডাক্তারী শাস্ত্রের যে সাহায্যটুকু পেয়েছি তার জন্য বন্ধু ডাঃ মানব মুন্সীকেও আমার ধন্যবাদ।

অমল দত্ত

২এ, সিকদার পাড়া লেন
কলিকাতা—৭

শরীর

আমাদের মত প্রচণ্ড গরমের এবং ঘাম প্যাচপ্যাচে আবহাওয়ার দেশে ৭০ মিনিট অথবা ৯০ মিনিটের ফুটবল যে অতি শ্রমসাধ্য খেলা সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

অনেক শারীর বিশেষজ্ঞ 'ওভার-এক্সারসাইজ' বলে এদেশের ছেলেদের ফুটবল খেলা থেকে বিরত থাকতে উপদেশও দেন। তাঁদের প্রধান যুক্তি—খেলাধুলো, অথবা ব্যায়াম, সবকিছুর মুখ্য উদ্দেশ্যই শরীরকে সুস্থ, সবল এবং নীরোগ রাখা। তাই যে খেলা এর উল্টোদিকে শরীরকে নিয়ে যায়, তা সর্বদাই বর্জনীয়। এ ছাড়াও এই খেলায় শরীরের যে ক্ষয় হয়, তার পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় যেসব খাদ্যের একান্তই দরকার এবং যার অভাব ঘটলে শরীর মারাত্মক রোগে আক্রান্তও হতে পারে—তা আমাদের দেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ক'জন তাদের ছেলেদের যোগান দিতে পারে!

আবার অন্যপক্ষেরা এ যুক্তি নস্যাৎ করে বলেন যে, মানুষের শরীর এমনভাবে তৈরী, কঠিন শ্রমশীল কাজও দীর্ঘ উপযুক্ত অনুশীলনে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে বাধ্য। তাঁরা আঙুল দেখিয়ে বলেন—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খর রোদে সাধারণ কলমপেষা মানুষ যখন একটু ছায়ার জন্য ছটপটিয়ে বেড়ায় কিংবা পাখার তলায় বসে ঝিমোয়, তখন ঠেলাওয়ালারা কিংবা রিক্সাওয়ালারা গাড়ীতে ভারী ভারী মাল নিয়ে হাওড়া ব্রিজের কঠিন চড়াই ভাঙে। তাদের শরীর ঘামে জবজবে অথবা ক্লান্ত হলেও, তা নিতান্তই সাময়িক। এ কাজ তাদের শরীরকে কাবু করতে পারে না। এবং দিনের পর দিন তারা এ কাজ চালিয়েও যায়। অথচ তাদের দৈনিক আহারে কতটা খাদ্যপ্রাণ তারা রাখতে পারে! আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে যা খাওয়া হয় তার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারলেই যথেষ্ট। আসলে আমাদের এই শরীর কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে সৃষ্ট। প্রতিদিনের কঠিন দৈহিক পরিশ্রম শরীরের প্রতিটি কোষের মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়ে শারীরিক অবস্থা এমন করে তোলে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে রাতারাতি সেই মানে পেঁছতে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যাওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

তবে এই সব বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেন, যার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয়—তার ফুটবল খেলা শেখার চেষ্টা না করাই উচিত। কেননা এতে তার উপকারের বদলে অপকারের সম্ভাবনাই বেশী।

তাই অনুশীলন শুরু করার আগে রক্তের চাপ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার এবং কিডনী ঠিকমত কাজ করছে কি না ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে নেওয়া বিশেষ দরকার। চোখের এবং কানের যেন কোন দোষ না থাকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত চশমা পরে ফুটবল খেলা রীতিমত ভয়ের কারণ ছিল। কিন্তু এখন 'কনট্যাক্ট লেন্স' ব্যবহারের ফলে যে কোন ফুটবলার চোখের দোষ নিয়েও ফুটবল খেলতে পারে। অবশ্য এটা ব্যয়সাপেক্ষ।

খারাপ দাঁত, পায়োরিয়া এবং দূষিত টনসিল ভবিষ্যতের জন্য খুবই খারাপ।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ফুটবলাররাই খেলা অথবা অনুশীলনের পর বুটটা কাদামাখা অবস্থায় ফেলে রেখে দেয়। পরের খেলার আগে, বুটের চামড়া যখন শক্ত হয়ে ওঠে, পায়ে দিতে লাগে, তখন বুটটা আচ্ছা করে জলে ভিজিয়ে নরম করে মাঠে খেলতে নামে। এর ফলটা অবশ্য একান্তই সাময়িক। কয়েক মিনিট পরেই হাওয়া ও রোদ লেগে বুটের চামড়া আবার সেই আগের মতই শক্ত হয়ে যায়।
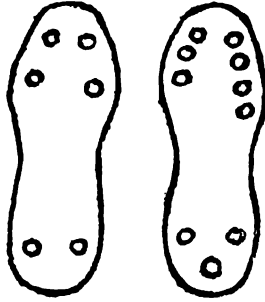
ফুটবলারকে এ ব্যাপারে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে খেলার প্যাণ্ট, সাসপেনসর, মোজা ও ইউনিফর্ম যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তেমনি বুটেরও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কেননা এই বুটও তার ভাল খেলার একটি প্রধান অবলম্বন। বুটের কাদা ছুরি দিয়ে না চেঁচে, জলে ধুয়ে, ভেতরে খবরের কাগজ পুরে হাওয়ায় শুকোতে দিতে হবে। রোদ অথবা আগুনে শুকোলে চামড়া তার নমনীয়তা হারাবে। বুটের উপর ভাগে নিয়মিত কালি এবং তলায় চর্বি অথবা গ্রীজ ব্যবহার করা উচিত। বাজারে সস্তাদরে যে ফুটবল বুট পাওয়া যায় তা অতি অল্প দিনেই ছেঁড়ে। একটু জল লাগলেই পায়ে হলহল করে। আবার শুকিয়ে গেলে, গুটিয়ে পায়ের তুলনায় ছোট হয়ে যায়। এবং এগুলো প্রায়ই কাঁচা চামড়া দিয়ে তৈরী হয় বলে এবং 'টাইট ফিটিঙে'র জন্য পায়ের আঙুলে কড়া পড়ে। এবং এই কড়ার জন্য ফুটবলারের স্বচ্ছন্দ গতিবিধিতে যথেষ্ট বাধা আনে। তাই যদি সম্ভব হয় একটু বেশীদামে ভাল চামড়ার বুট কিনলে, এই বাড়া-কমার অসুবিধায় ভুগতে বা কড়ার জন্য কষ্টও পেতে হয় না। এবং টেকেও বেশীদিন।

বুটের মাপ দেবার সময়, অথবা কেনবার সময় দেখতে হবে পায়ের পাতা যেন চেপে না থাকে। অর্থাৎ পায়ের আঙুল যেন সহজভাবে নাড়ানো যায়। গোড়ালি কিন্তু টাইট থাকবে। অনেকে খুব নীচু (অনেকটা এ্যাথলীটদের রানিং শু-এর মত) গোড়ালির বুট পরে। তাতে সমস্ত শরীরের ওজন পায়ের পাতার ওপর এসে পড়ে—যা ফুটবলারের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়া খেলবার সময় প্রায়ই পা থেকে বুট খুলে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে।

দু'টি ষ্টাড লাগানো বুট পরে যদিও প্রায় এদেশের সব ফুটবলাররাই খেলে, তাহলেও শুকনো মাঠে এর একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, চারটি ষ্টাডের ওপর দেহভার পড়ায় প্রায়ই খেলাচলাকালীন অবস্থায় ষ্টাড উঠে যায়। এতে বিশেষ অসুবিধা হয়। সেই তুলনায় শরীরের ওজন চারিয়ে যায় ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে

সামনের দিকে ৭টি ষ্টাডে। পায়ের পেশী, বিশেষ করে পায়ের গুলি এতে বিশেষ আরাম পায়। ষ্টাড খুলে যাবার সম্ভাবনাও খুব কম।

ফুটবলারের ক্রেপ ব্যানডেজ অথবা অ্যাংকলেট ব্যবহার করা উচিত নয়। অ্যাংকেল যদি সহজভাবে চারদিকে ঘুরতে না পায়, তাহলে জোরে ছোটা, শ্যুটিং, ড্রিবলিং এবং ফুটবলের সূক্ষ্ম কাজগুলি কিছুতেই করা সম্ভব নয়। তাই একমাত্র এ্যাংকেলের চোট ছাড়া ফুটবলারের কিছুতেই এইসব পরা উচিত নয়। শুধু সিনগার্ড সব সময় ব্যবহার করা যেতে পারে।

ল্যাঙট অথবা সাসপেনসর ব্যবহার করলে কোমরের স্বচ্ছন্দ গতিবিধিতে যথেষ্ট আড়ষ্টতা আনে। কাজেই কেউ যদি এইসব না পরে খেলে, তাহলে ফুটবলারের যথেষ্ট খেলার সুবিধা হবে। অসুবিধার কোন ভয় নেই। ল্যাঙট ব্যবহারে আরও দেখা গেছে, জঙ্ঘার দুপাশে ঘায়ের সৃষ্টি করে। এবং এ নিয়েই খেলতে হয় বলে ঘা কিছুতেই শুকোতে চায় না। সাসপেনসর সেই তুলনায় ঘায়ের সৃষ্টি কম করে। এবং এই সাসপেনসর কেচে রোদে শুকোতে না দিয়ে সব সময় হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হয়।

আমাদের এই গরম ঘাম-প্যাচপ্যাচে আবহাওয়ায় কি খেলায় কি অনুশীলনে, এমন ইউনিফর্ম ব্যবহার করতে হবে, যার ভিতর দিয়ে বাতাস শরীরের ভেতরের ঘামকে শুষে নিতে পারে। কাজেই সব সময় গেঞ্জি জাতীয় জিনিষের ইউনিফর্ম ব্যবহার করাই উচিত। বিরতির সময় কোন খেলোয়াড় যদি এই ঘাম-জ্যাবজেবে ইউনিফর্ম বদল করে শুকনো ইউনিফর্ম পরে দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নামে, তাহলে শরীরের দিক থেকে সে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে।

প্রসিদ্ধ ফুটবল সমালোচক টেরেন্স ডিলেনি ফুটবল খেলায় 'স্টাইল' সম্পর্কে আলোচনা করতে তাঁর প্রসিদ্ধ 'এ সেন্চুরি অব সকার' বইতে লিখছেন—
"If you love the game, you must pause to watch the small boys—in parks and playgrounds or in back streets of cities. In England, under grey sky, on scarred grass or damp asphalt, it is a vigorous, buffetting game with hard shots, theatrical, headlong saves, hard tackles, and shoulder charges. The players surge about, calling for passes, shouting protests or instruction; they are flushed and animated, they fall and scramble up again and, from time to time, one bends to dab carefully a grazed knee".

অর্থাৎ 'যদি তুমি খেলাকে ভালবাস, তাহলে পার্কে, খেলার মাঠে, অথবা শহরের কানাগলিতে ছোট ছোট ছেলেদের লক্ষ্য করতে নিশ্চয় দাঁড়াবে। ইংল্যাণ্ডে—ধূসর আকাশের নীচে ক্ষতচিহ্নিত ঘাসে, অথবা স্যাঁৎস্যাঁতে অ্যাসফাল্টের ওপর তীব্র শটে, নাটকীয়তায়, সাধ্যের শেষ সীমানায় ঝাঁপিয়ে বল বাঁচানয়, প্রচণ্ড শক্তিতে বল ট্যাকলিঙে এবং কাঁধ দিয়ে ধাক্কাধাক্কির এ এক বলপ্রয়োগে ভরা সতেজ খেলা। উত্তাল তরঙ্গের মত খেলোয়াড়রা সেখানে ঘুরে ফিরে পাশ চাইছে, তীব্রস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে অথবা উপদেশ দিচ্ছে; মুখ তাদের রক্ত-লাল এবং জীবন্ত, তারা মাটিতে পড়ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঠেলে উঠছে, এবং ওরই ভেতর মাঝে মাঝে কেউ হয়ত নীচু হয়ে ছড়ে যাওয়া হাঁটুতে সযত্নে হাত বুলিয়ে নিচ্ছে।'

In Italy, perhaps in a quiet square in Milan, or on the hard sand of a Mediterranean beach, you lean back in the shade to watch the boys. It is quieter. If there are about half a-dozen boys, they stand in a wide ring; the lighter ball is in the air a good deal, bounced on the instep, on the knee, or on the head; it rolls or bounces, shimming from one to another; they leap to reach it, topple back for overhead kicks but they do not interfere with each other much. While one has it, the others wait or impatient, call for their turn. Their legs are bare and their shoes are light and they move consciously, knowing you are watching.

'ইটালিতে—হয়ত মিলানের কোন নিস্তব্ধ পার্ক, কিংবা ভূমধ্যসাগরের কোন বিচের শক্ত বালিতে, একটু ছায়া-ঘেরা জায়গায় শরীর পিছনে এলিয়ে দিয়ে ছেলেদের লক্ষ্য করছ। এখানে আরও প্রশান্তি। যদি এখানে ছ'টি ছেলেও থাকে, তারা বড় বৃত্তের আকারে দাঁড়িয়েছে। তুলনায় হাল্কা বল ইনস্টেপ, থাই ও মাথায় প্রতিঘাত করে শূন্যে বেশ কিছুক্ষণ থাকছে। বল কখনও মাটিতে, কখনও শূন্যে একজনের কাছ থেকে অন্যের কাছে ঘুরছে। তারা বল ধরতে লাফাচ্ছে শূন্যে বাইসাইকেল কিক্ করে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ছে। কিন্তু অন্যের কাজে কেউ তারা বিশেষ হস্তক্ষেপ করছে না। একজনের কাছে যখন বল, অন্যেরা তখন অপেক্ষারত, অধৈর্য হলে তাদের পালার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। হাল্কা জুতো ছাড়া পা তাদের খালি এবং তাদের নড়াচড়া ব্যাপারে তারা বেশ সচেতন। কেননা তারা জানে যে তুমি তাদের লক্ষ্য করছ।'

এরপরই ডিলানি লিখছেন— climate, temperament, history—all, these contribute to style, which is an aspect of character, individual or national.

অর্থাৎ আবহাওয়া, স্বভাব, ইতিহাস—এ সব কিছুই 'স্টাইল' তৈরি করতে সহায়তা করে, যা ব্যক্তির অথবা জাতির চরিত্রের একটা চেহারা।

এই স্টাইলের বৈচিত্র্য ভারতীয় ফুটবলেও বিশেষ করে নজরে পড়ে। উত্তর ভারতের পানজাব অথবা উত্তর প্রদেশের কথাই ধরা যাক। খেলার মাঠ এখানকার খুবই রুক্ষ। কিন্তু অন্য প্রদেশের তুলনায় এ প্রদেশবাসীর শরীরে শক্তি ও পরিশ্রম করবার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অন্য প্রদেশবাসীর তুলনায় অনেক বেশী। এবং বর্তমানে ফুটবল শিক্ষায় এরা বিশেষ আগ্রহী এবং আধুনিক ফুটবলে যথেষ্ট ট্রেনিং নেওয়া সত্ত্বেও এদের নিজস্ব কোন স্টাইল আজও গড়ে উঠতে পারেনি।

এরা যে ধরনের খেলা খেলে থাকে, তাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'কিক্ অ্যান্ড রান'। অর্থাৎ বল মেরে দৌড়ন। সেই সঙ্গে এদের খেলাতে রয়েছে অযথা দৈহিক বলপ্রয়োগ এবং রাফ ট্যাক্লিঙের বাড়াবাড়ি। এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় ফুটবলারদের খেলার তুলনা করলে প্রভেদটা স্পষ্ট হয়। এখানকার খেলার মাঠ উত্তর ভারতের মতই যদিও রুক্ষ ও কঠিন, কিন্তু এখানের ফুটবলারদের শরীরে শক্তি ও কর্মক্ষমতা উত্তর ভারতের তুলনায় অনেক কম। তবু এরা ফুটবলে বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী বলে এদের খেলার একটা নিজস্ব স্টাইল সহজেই চোখে পড়ে। দৈহিক বলপ্রয়োগ অথবা ধাক্কাধাক্কি এদের খেলাতে নেই বললেই চলে। ঠাণ্ডা মাথায় বল দেওয়া-নেওয়া ও সেই সঙ্গে ছোট ছোট পাশে খেলতেই এরা সুদক্ষ। ড্রিবলেও এদের অনেকেরই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখা যায়।

এবার বাংলা দেশের ফুটবলের দিকে তাকালে, উপরের দুটো ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর এক ধরনের 'স্টাইল' বা ধারা আমরা দেখতে পাব। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্য এখানকার খেলার মাঠ বেশ নরম এবং সবুজ ঘাসে ভরা—যা উন্নতমানের ফুটবল খেলার জন্য একান্ত ভাবেই অপরিহার্য। এ মাঠে বল আয়ত্তে রাখা, বল নিয়ে ছোটা, বা ড্রিবল করা অন্য প্রদেশের রুক্ষ মাঠের তুলনায় যেমন অনেক সহজ, তেমনি দৈহিক সংঘর্ষের এ খেলায় মাটিতে যে রকমভাবে হোক পড়ে গেলেও চোট লাগবার সম্ভাবনাও ফুটবলারের প্রায় নেই বললেই চলে। একশো বছরের কাছাকাছি এ খেলা এখানকার জনমানসে এমনই জড়িয়ে ছিল, যা আজও আছে যে, তাদের জীবনের ভালমন্দ থেকে এ খেলাকে বিচ্ছিন্ন করা এক কথায় অসম্ভব। এখানকার ফুটবলাররা অন্য প্রদেশের ফুটবলারদের তুলনায় কিছুটা দুর্বল হলেও গতি এবং শারীরিক চটপটে ভাব কিন্তু এদের অনেক বেশী এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং কল্পনাপ্রবণতাতেও এরা অনেক উন্নত। কাজেই এখানকার ফুটবল প্রচণ্ড গতিশীল এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিক কল্পনার স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল হয়ে অন্য আর এক ধরনের ঘরানার সৃষ্টি করেছে।

কোন কোচের অধীনে ফুটবল খেলা যারা সবে শিখতে শুরু করছে, তাদের এই স্টাইলের সমস্যাটা তত অনুভব করতে হয় না। কিন্তু যারা কোন এক বিশিষ্ট ধারায় খানিকটা বা পুরোপুরি পরিণত হয়ে পরে কোন কোচের অধীনে বা নিজে নিজেই ভাল ফুটবলার হবার জন্য জোর অনুশীলন শুরু করে, তাদের জীবনে এ সমস্যাটা প্রকট হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। বল নিয়ে সে ছুটবে, না বল পাওয়া মাত্রই পাশ দেবে! ড্রিবল করা কি উচিত? কেননা এ করতে গিয়ে তার শরীরকে যেমন সে অযথা ক্লান্ত করবে, তেমনি বিপক্ষের ফুটবলারের বল কেড়ে নেওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। সেই সঙ্গে এতে খেলার গতিও শ্লথ হতে পারে।

কিন্তু টেরেন্স ডিলেনি 'স্টাইল তৈরী' প্রসঙ্গে আর একটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করেননি, সেটি হল নিদারুণ দারিদ্র্য। ইয়োরোপের ছেলেদের এ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় না বলেই হয়তো তিনি এটি নিয়ে আলোচনা করেননি, কিন্তু দারিদ্র্য একদিকে যেমন আমাদের দেশের ছেলেদের পূর্ণাঙ্গ জিমন্যাসিয়াম, খেলার উপযুক্ত সরঞ্জাম, অথবা প্রশিক্ষক জোগান দিতে পারেনি তেমনি স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ তেইশ বছর পরেও গভর্মেন্ট, কর্পোরেশন, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের স্পোর্টস-মানসিকতার অভাবে তৈরী হয়ে ওঠেনি ছেলেদের একান্ত প্রয়োজনীয় যথেষ্ট খেলবার মাঠ।

আমাদের দেশে এ কথা আজ সর্বতোভাবে স্বীকৃত যে, খালি পায়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্য এক কথায় অসম্ভব। এবং এই কারণে এ দেশে বুট পরে ফুটবল খেলা এখন বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমাদের মত গরম দেশে জুতো পরে যেমন সব সময় চলাফেরা করা বা পরে থাকা সম্ভব নয়, তেমনি অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য এ দেশের ছেলেরা একজোড়ার বেশী জুতোও পায় না। এবং এই জুতো পরে বল খেলাও তাই তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না। যা ইয়োরোপীয় ছেলেদের পক্ষে সম্ভব। প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে বাঁচতে সবসময় জুতো পরেই তাদের থাকতে হয়। এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই জুতো পরেই হাঁটা, দৌড়নো, খেলা সব কিছুই করে বলে, একদিকে যেমন তারা উত্তর জীবনে ফুটবল বুটের অতিরিক্ত ওজনটুকুর জন্য আগে থেকেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে বুট পরে খেলার আঙ্গিকগত কলাকৌশলেও বিশেষ সুদক্ষ হয়ে ওঠে। তুলনায়

আমাদের দেশের ছেলেদের অবস্থাটা উল্টো। ছোটবেলা থেকে খালি পায়ে পিচের রাস্তার উপর অথবা এবড়োখেবড়ো পোড়ো জমিতে ক্যাম্বিস অথবা রাবার বল দিয়ে খেলে তাদের এক ধরনের 'স্টাইল' বা ভঙ্গি এবং পদ্ধতিও গড়ে ওঠে। তারা যখন কোন কোচের কাছে ট্রেনিং নিতে যায়, তখন অধিকাংশেরই একটু বয়স হয়ে গেছে এবং তখনই প্রথম বুট পরে খেলতে শেখে বলে, প্রথমেই তাদের যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তা হল অবচেতন মনের ভয়। এবং তারই দুটি ভিন্ন ধরনের উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি।
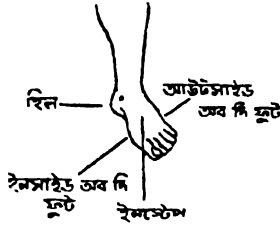
উপরের ছবিতে পায়ের চারটি অংশ দেখানো হচ্ছে। ইনসাইড অব দি ফুট, আউটসাইড অব দি ফুট, ইনষ্টেপ, এবং হিল। খালি পায়ের ফুটবলে (যারা ক্যাম্বিস বা রাবার বলে খেলে অভ্যস্থ) ইনষ্টেপ অর্থাৎ পায়ের পাতা ব্যবহার করতে গেলেই অ্যাংকেলে ব্যথা লাগে এবং পায়ের পাতা মাটিতে ঘষটানি লেগে ছালচামড়া উঠে যায় বলে, তাদের অবচেতন মনে এমন ভয় ঢুকে যায় যে, স্বভাবতই তারা ইনষ্টেপ দিয়ে মারার বল ইনসাইড অব দি ফুট দিয়ে মারতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। উত্তর জীবনে বুট পরে যখন তাদের ইনষ্টেপ দিয়ে কিকিং অনুশীলন করতে বলা হয়, তখন বুটের ডগা মাটিতে লেগে অ্যাংকেলে চোট লাগবার ভয় কাটিয়ে ওঠা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। অনেকে আবার সম্পূর্ণ ভয় কাটাতে না পারলেও, খানিকটা সাহস করে, অ্যাংকেল বেঁকিয়ে নিজের মত এমন একটা সামঞ্জস্য করে নেয়, যাতে পায়ে না লাগে। আপাতদৃষ্টিতে বা অনুশীলনের সময় এর ত্রুটি ধরা না পড়লেও খেলার সময় এই শট্ এদিক ওদিক বেঁকে যায় এবং প্রায় ক্ষেত্রে বল বারের উপর দিয়ে চলে যায়।

এদেশে যখন খালি পায়ের ফুটবলের প্রচলন ছিল, তখন পায়ের চেটো দিয়ে বল টেনে ড্রিবল, একটা ফলদায়ক পদ্ধতি ছিল এবং এটা একটা আলাদা ধরনের স্টাইল গড়ে তুলেছিল—যা ছিল ভারতীয় ফুটবলারদেরই একান্ত নিজস্ব। পৃথিবীর অন্য কোন ফুটবলারদের এ জাতীয় ড্রিবল করতে দেখা যেত না।

কিন্তু '৫৭-৫৮ সালের পর থেকে ভারতীয় ফুটবলাররা বুট পরে ইয়োরোপীয়ান কায়দায় বল দ্রুত আদান-প্রদানে অভ্যস্ত হতে গিয়ে দেখা গেল যে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বিপক্ষের সামান্য একজন ডিফেন্ডারকেও সে কাটাতে পারছে না। অর্থাৎ একদিকে যেমন সে পূর্বের বহুল প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতিকে ভুলে গেছে, অন্যদিকে ইয়োরোপের ফুটবলারদের মত শরীরের উপরের অংশে দোলা বা ঝাঁকুনী দিয়ে ড্রিবল করার পদ্ধতিও শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি। অবশ্য এ কথা সত্য যে বুটের তলা দিয়ে ভিজে বলকে টানা মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু শুকনো মাঠে, শুকনো বলে এই

কাজ বুট পরেও যে সম্ভব এবং রীতিমত ফলদায়ক তা আমরা বিদেশী টীমের বিরুদ্ধে দু-একজন ভারতীয় ফুটবলারের খেলাতেও দেখেছি। যারা খালি পায়ে রাবার, ক্যাম্বিস বা ফুটবল খেলে তারাও এ ধরনের ড্রিবলিংয়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ঠিক, কিন্তু বুট পরে খেলতে গিয়েই বা অনুশীলনের শুরু থেকেই, তারা এটাকে প্রাণপনে ভুলতে চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, আপন প্রবৃত্তি দিয়ে যা কিছু সে স্বভাবজাত করেছে—তার সব কিছুই সে প্রয়োজনহীন মনে করতে থাকে। উত্তর জীবনে বুট পরে খেলতে গিয়ে, এই ধরনের মনোভাব আমাদের ফুটবলারদের মনে চেপে বসে। আসলে কিন্তু তা নয়।

বুট পরে খেলা হাঁটা বা দৌড়নোর মত সহজাত নয়; ধৈর্য ধরে শিখতে হয়। এরপর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলে তবেই 'সম্পূর্ণ ফুটবলার' হিসেবে আখ্যাত হতে পারে। যেমন একজন সাধারণ লোকের লেখার সঙ্গে কোন সুসাহিত্যিকের লেখার তফাত। দুজনের লেখা ব্যাকারণসম্মত হলেও—শেষোক্তের লেখা যে প্রসাদগুণে সবাইকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করে, তা হল—প্রকাশের ভঙ্গিপ্রসূত ব্যঞ্জনা। এবং একেই ফুটবলে 'স্টাইল' বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে ব্রাজিল ফুটবলের কথাই ধরা যাক। ব্রাজিল ফুটবল খেলা শিখেছে প্রায় আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের মতই ব্রিটিশদের কাছ থেকে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা আজ পর্যন্ত কোনদিন ইয়োরোপীয়ান ফুটবলের কাছে আত্মবিক্রয় করেনি বা নকল করবার চেষ্টাও করেনি। আজকের জগৎবরেণ্য অনেক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারেরই শৈশব ও কৈশোর কেটেছে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের চেয়েও অনেক বেশী দারিদ্র্যের মধ্যে। পথেঘাটে তারা ফুটবল খেলেছে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। উত্তরজীবনে বড় বড় ক্লাবের সংস্পর্শে এসে নানান ধরনের সুযোগ এবং বিভিন্ন কোচের নির্দেশ সত্ত্বেও, তারা তাদের স্বাধীন প্রকাশ ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটুকু প্রচন্ড মনের জোরে, বলতে গেলে যুদ্ধ করেই অক্ষুণ্ণ রেখে শুধু যে ব্রাজিলকে তিনবার ওয়ার্ল্ড-কাপ পাইয়ে দিয়েছে তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে এক বিশিষ্ট ফুটবল ঘরানারও সৃষ্টি করেছে। আর এই সৃষ্টিতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের যা কিছু ফুটবল-উপযোগী মনে করেছে, তাই মিশিয়ে দিতে তারা এতটুকু দ্বিধা করেনি। যেমন 'সাম্বা' ওদের জাতীয় নাচ। ছেলেমেয়ে, বাচ্চা-বুড়ো সবাই এ নাচে অভ্যস্ত। কোমরের যে অতিরিক্ত দোলনটুকু এ নাচের বৈশিষ্ট্য—তাও এরা ফুটবলে ড্রিবলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। তাই অন্য কোন দেশের ফুটবলারদের পক্ষে এই ব্রাজিলিয়ান স্টাইল অনুকরণ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এ শিক্ষাগতও নয়।

এই স্টাইল প্রসঙ্গে তাই ফুটবলারকে মনে রাখতে হবে যে কৈশোরে রাস্তায় অথবা মাঠে, খালি পায়ে রাবার-ক্যাম্বিস বলে যে খেলাটুকু সে খেলেছে—তা ফুটবল জীবনের একটি অধ্যায়। পরে বুট পায়ে কোচের কাছে যা শিখবে তা অপর একটি অধ্যায়, এবং খেলার সময় স্বাধীনভাবে যে খেলা সে খেলবে তাও আর একটি অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। সবাই স্বতন্ত্র হলেও কেউ পূর্ণ নয়। সব অধ্যায়গুলো মিলে যেমন একটা বই হয় তেমনি এই সব অধ্যায়গুলো মিলিয়ে হয় একজন 'কমপ্লীট ফুটবলার'। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যার লক্ষ্য থাকবে শুধু নিখুঁত হয়ে ওঠার।

স্কিল

আমরা যা কিছু শিখি তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যা শিখতে শুধু মানসিক শক্তিরই দরকার, দৈহিক শক্তি প্রায় লাগে না বললেই চলে, তাকেই বলা হয় জ্ঞান। আর যেখানে মানসিক সক্রিয়তা অল্প, কিন্তু দেহের অংগ-প্রত্যংগের সচলতাই সব, তাকেই বলা হয় দক্ষতা বা কৌশল। ইংরাজীতে একেই বলা হয়—স্কিল।

একটা ফুটবল যদি দুটো দল করে বাইশ জন (ফুটবল খেলায় তেমন অভ্যস্থ নয়) ছেলের মাঝে ফেলে দেওয়া হয় তা হলে দেখা যাবে ঐ বাইশজনের ভেতর সবাই একই রকম ভাবে খেলছে না। কেউ হাত দিয়ে গোল বাঁচাবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় গোলে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশই বল পেলে আর ছাড়তে চাইছে না। কেউ বলটা কেড়ে নেবার জন্য চিনে জোঁকের মত সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ আবার বল খুব উচুঁতে এবং দূরে পাঠিয়েই খুশী। ওরই ভেতর কেউ কেউ গোল করবার অধীর আগ্রহে যেখান-সেখান থেকে গোলে শট মারছে। এরই পাশাপাশি যদি আজকের পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ ফুটবল ম্যাচকে রাখি তা হলে আগের ছেলেগুলোর মত একই স্বভাব প্রতিফলনের ছবি এখানেও দেখতে পাব। তফাত শুধু এরা অনেক বুদ্ধিদীপ্ত এবং অনুশীলনে পরিশীলিত। এবং নামগুলো ফুটবলবিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্নিত। যেমন গোলকীপার, ডীপ ডিফেন্ডার, হার্ডট্যাকলার, লিবারো, লিঙ্কম্যান, ফাস্ট উইংগার, স্কিমার অথবা স্ট্রাইকার।

স্কিল-ট্রেনিং শুরু করবার আগে তাই ফুটবলারকে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ফুটবলারের ভেতরই, বিশেষ কোন পজিসনে খেলবার কিছু না কিছু স্বাভাবিক দক্ষতা থাকবেই এবং সেই সংগে থাকবে তার মনের কোণে প্রবল ইচ্ছা—নিজেকে সেই পজিসনে পূর্ণভাবে প্রকাশ করবার। এখন কোন ফুটবল-বিশেষজ্ঞ যদি তাকে তার এই স্বাভাবিক দক্ষতার সংগে তার মনের ইচ্ছার মিল আছে বলে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে সে সেই পজিসনের স্কিল-অনুশীলনে এগিয়ে যেতে পারে। না হলে নিজেই তাকে ঠিক করতে হবে নিজের পজিসন।

এ বিষয়ে এতটা গুরুত্ব দেবার কারণ যে স্কিল অনুশীলনের পরিসর এমন সুবিস্তৃত বৈচিত্র্যময় এবং নিত্য-নতুন আবিষ্কারে পরিবর্ধিত এবং সেই তুলনায় প্রত্যেক ফুটবলারেরই গ্রহণ-ক্ষমতা তার আপন স্বভাবেই এত সীমিত যে, তার পক্ষে সব কিছু শেখা অসম্ভব।

যদিও আজকের পৃথিবীতে ফুটবলে অগ্রসর দেশগুলোতে (যেমন ইংল্যান্ড এবং হাংগারী) ১৫।১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবলারকে কোন নির্দিষ্ট পজিসনে না খেলিয়ে স্কিলের সব দিকেতে চৌকস করে এবং সব পজিসনে খেলিয়ে, তারপর তাকে তার উপযুক্ত জায়গায় খেলতে দেওয়া হচ্ছে। তবু সেখানেও নির্দিষ্ট এবং উপযুক্ত জায়গার সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে। তার আগে যেটা তাকে করান হচ্ছে, সেটা খালি বর্তমান ফুটবলের দ্রুত ম্যানুয়েভারিঙের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। যেমন একজন রাইট ব্যাককে বলা হল সুযোগ পেলেই এগিয়ে গিয়ে রাইট আউটের মত বিপক্ষের টাচ লাইনে পৌঁছে মাপা গোল এরিয়ায় ব্যাক সেণ্টার করতে। এখন সেই ব্যাকের যদি রাইট আউট খেলার কোন রকম অভিজ্ঞতা না থাকে, তা হলে তার পক্ষে ফরোয়ার্ডের এই দুরূহ কাজটি কি করা সম্ভব হবে?

বিদেশে এই যে কমপ্লীট ফুটবলার তৈরী করবার সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরি-কল্পিত প্রচেষ্টা তা আজও আমাদের কল্পনার এবং সেই সংগে আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে রয়ে গেছে। কাজেই যা এ দেশের ফুটবলারদের এখনই প্রথম

শিক্ষার্থী হিসেবে করা সম্ভব, স্কিলের সেই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোই ভালভাবে অনুশীলন করা উচিত।

পাশিং, কিকিং, ট্র্যাপিং, হেডিং, ট্যাকলিং এবং ড্রিবলিং-কেই ফুটবল-স্কিলের অ, আ, ক, খ, বলা যেতে পারে।

পাশিং

পাশিং-কে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) মাটি ঘেঁষা পাস।

(২) মাটির ওপরে পাস।

মাটি ঘেঁষা পাস—ফুটবলার পায়ের চারটি অংশ দিয়েই দরকারমত এই মাটি ঘেঁষা পাস দিতে পারে। তবে সবসময়েই মারতে হবে বলের ঠিক মাঝখানে। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'মিড লাইন।'

পুশঃ—এই পাসকে বলা হয় পুশ্। যে পা দিয়ে বল মারা হচ্ছে না অর্থাৎ 'নন কিকিং ফুট' থাকবে বলের লাইনে এবং এক বিঘত দূরে। বল পুরোপুরি লাগবে ইনসাইড অব দি ফুটে। হাঁটু এবং চোখ উপরের ছবির মত বলের ওপর। বল যাকে দেওয়া হবে, বল মারবার পর পা তার দিকে যতটা পারা যায় নিয়ে যেতে হবে। এই পাসের দূরত্ব ২০ গজ। পায়ে যাদের খুব জোর আছে তাদের ক্ষেত্রে ৩০ গজ পর্যন্তও হতে পারে। তবে তার বেশী হলেই গতির তীব্রতা না থাকায় বল বিপক্ষের ছিনিয়ে নেবার সম্ভাবনা।

জ্যাবঃ—এইরূপ পাসের সময়ও পুশের মতই নন্ কিকিং ফুট এক বিঘত দূরে এবং হাঁটু বলের ওপর থাকবে। পুরো ইনস্টেপ ঠিক বলের মাঝখানে লাগবে। এ পাসে বলের গতির তীব্রতা যেমন পুশের চেয়ে অনেক বাড়ানো যায়, তেমনি দূরত্বও ৪০।৫০ গজ পর্যন্ত করা যেতে পারে। বিশেষ করে বৃষ্টির এবং কর্দমাক্ত মাঠে পুশ করলে বল জল অথবা কাদায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে ক্ষেত্রে এই জ্যাব পাস বিশেষ কার্যকরী। এ ছাড়া চলন্ত বলে থ্রু পাস দেবার সময় এই পাসই বিশেষ উপযোগী।

১

২

'লফ্‌ট' কিকঃ—তিনটি 'লফ্‌ট কিকে'র ছবি। ১নং ছবিতে বল এবং পায়ের সংযোগ দেখানো হচ্ছে। বুড়ো আঙুলের দিকের পুরো ইনস্টেপ বল এবং মাটির সংযোগস্থলে লাগছে। নন্‌ কিকিং ফুট কিন্তু থাকবে এক হাত দূরে এবং খানিকটা পিছনে এবং হাঁটু বলের ওপর। ২নং ছবিতে সারা শরীরের অ্যাকসন দেখানো হচ্ছে। ছড়ানো দুই হাত শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করছে। এ পাসের সমস্ত শক্তিটা আসছে পাছার এবং উরুর পেশীগুলো থেকে এবং চোখ রয়েছে বলের ওপর।

৩

৩নং ছবিতে পাস দেবার পর, শরীরের সঙ্গে 'কিকিং ফুটে'র বলের দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার নিয়মটি দেখানো হচ্ছে। একেই ইংরাজীতে বলা হয় ফলো থ্রু। এই যে বল মারবার আগে পা পেছনে টানা, বল মারা এবং মারবার পর হাঁটু শক্ত করে বলের দিকে পাকে সামনের দিকে যতটা পারা যায় ছুঁড়ে দেওয়ার—এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'সুইংগিং অব দি লেগ।' ফুটবলারের বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে যে, সুইঙ্গিঙের জন্য তার আগের পদক্ষেপটি বড় করে ফেলতে না পারলে এ পাস কিছুতেই সম্ভব হবে না। এবং বল যেন ২০ ফিটের ওপরে না ওঠে।

কিকিং

ফুটবল খেলার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যই হল বিপক্ষের জালে বল ঢুকিয়ে দেওয়া। এবং এই গোল করতে হলে ১০০টার ক্ষেত্রে ৯৯টাই আসবে ইনস্টেপের ব্যবহারে। তীব্রগতির শটেরও নির্ভুল লক্ষ্যের জন্য ইনস্টেপের সাহায্য বিনা উপায় নেই।

ক্যাম্বিস বল, রাবার বল বা ফুটবল সব কিছুতেই ফুটবল অনুশীলন সম্ভব এবং বল-কণ্ট্রোলিং-এর জন্য প্রত্যেক ফুটবলারেরই সব রকম বলে অনুশীলন করা উচিত কিন্তু কিকিং-এর বেলায় চার কি পাঁচ নম্বর ফুটবলেই করা উচিত এবং সেই সঙ্গে প্রথম প্রথম বলের হাওয়া একটু কম রাখতে হয়। অনেক ফুটবলারের আবার ডান পায়ের ইনস্টেপ ঠিকমত চলে কিন্তু বাঁ পা ঠিকমত চলে না বা একদমই চলে না। সে ক্ষেত্রে পাঁচ নম্বর কি তার চেয়েও বড় বলে অল্প একটু হাওয়া ভরে কেউ যদি তার দিকে গড়িয়ে দেয় এবং ঐ গড়ান বলে ইনস্টপ দিয়ে রিটার্ন কিক্ বার বার তাকে যদি অনুশীলন করানো হয়, বা লোকাভাবে সেই ফুটবলার যদি নিজেই দেওয়ালে বার বার ঐ কিকিং অনুশীলন করে, তাহলে তার ভয় কেটে গিয়ে ঐ দুর্বল বাঁ পাটাও ডান পায়ের মত কিকিং-এ সক্ষম এবং সবল হয়ে উঠতে পারে। আজকের ফুটবলে ফুটবলারকে দুটো পা-এর ইনস্টপ সমান ভাবে চালাতেই হবে, না হলে সার্বিক ফুটবলার হওয়া তার পক্ষে ভীষণ কঠিন।
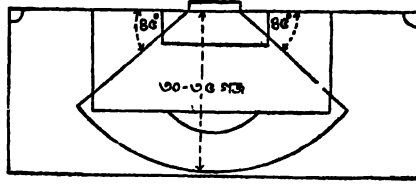
এই ছবিতে লাইন-টানা যে 'জোন'টি দেখানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে প্রত্যেক ফুটবলারেরই (তা ফরোয়ার্ডের বা ডিফেন্সের যাই হোক না কেন) চেতন থেকে অবচেতন মনে এত সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যা দিয়ে সে এই জোনের ভেতর বল নিয়ে কিংবা বল-ছাড়া ঢুকলেই চকিতে গোলে শট্ নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখতে পারে। এই জোনের বাইরে থেকে অর্থাৎ ৩০।৩৫ গজের চেয়েও বেশী দূর হয়ে গেলে ভাল গোলকীপারকে যেমন গোল করা সম্ভব নয়, তেমনি এই জোনের দু-পাশে ৪৫° লেখা যে দুটো কোণ দেখানো হয়েছে, যাকে বলা হয় 'ন্যারো অ্যাংগল' সেইখান থেকে বিপক্ষের গোলকীপার যদি প্রস্তুত থাকে, তা হলে ফুটবলারের গোলে শট মারা অনুচিত। কেননা, এ জায়গা থেকে গোল হয় না বললেই চলে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, গোল করতে হলে কোন জায়গা থেকে গোলে মারব আর কোথা থেকে মারব না, এ সম্পর্কে যে ফুটবলারের ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৈরী হয়নি, তার পক্ষে গোল করা অসম্ভব।
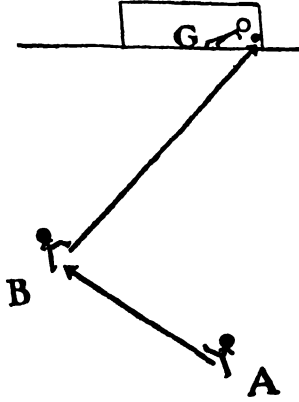
খেলায় যা কাজে আসবে না শুধু তারই অনুশীলনকে বলা হয় 'নেগেটিভ প্র্যাক্‌টিস'। যেমন কোনো ফরোয়ার্ড যদি অনুশীলনে শুধু গোলকীপারকে পোস্টে রেখে দশটার ভেতর দশটাই গোল করে, তা হলেও আসল খেলার সময় তার ভাগ্যে একটাও গোল না জুটতে পারে। কেননা, ভাল ডিফেন্সের বিরুদ্ধে সারা খেলায় সে এ-জাতীয় সুযোগ নাও পেতে পারে। কাজেই, আসল খেলার পরিবেশ অনুযায়ী অনুশীলনকেও গড়ে তুলতে না পারলে, ফুটবলারের কাছে সে অনুশীলনের কোনও দামই নেই। এই পরিবেশ অনুযায়ী অনুশীলনকেই বলা হয় 'কনডিশনিং প্র্যাকটিস'।

এই ছবিতে এ ধরনের অনুশীলনের প্রথম পর্যায়ের একটা নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে। 'এ' বলটিকে 'বি'-এর কাছে পুশ করছে এবং 'বি' সেই বলকে না থামিয়েই গোলে শট নিচ্ছে।
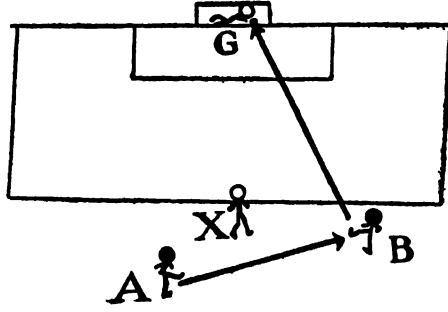
এই ছবিটি দ্বিতীয় পর্যায়ের। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ছবির মত অনুশীলনে অভ্যস্ত হলে তবেই ফুটবলার এটা শুরু করতে পারে। এ ছবিতে দেখা যাচ্ছে ‘এ’ বল ঠেলে দিচ্ছে ‘বি’-কে। কিন্তু মাঝখানে একজন প্রতিপক্ষ ‘এক্স’কে রাখা হয়েছে। সে আপ্রাণ বাধা দেবার চেষ্টা করবে যাতে ‘বি’ কিছুতেই গোলে কিক্ না নিতে পারে।
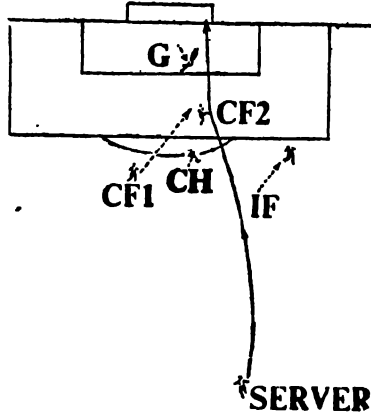
এই ছবিটি তৃতীয় পর্যায়ের। এর আগেরটির অনুশীলনে অভ্যস্ত হলে, এটি ফুটবলার আরম্ভ করতে পারে। সেণ্টার হাফ (CH) এবং সেনটার ফরোয়ার্ড (CF1) পরস্পর পাশাপাশি ‘বক্স এরিয়ার’ ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। সার্ভার অর্থাৎ যে-কোন একজন খেলোয়াড় বলটি দু'জনের মাথার ওপর দিয়ে ছবিতে কালো দাগ দেওয়া লাইনের মত তুলে দিচ্ছে। এখন সেনটার ফরোয়ার্ড তীব্র গতিতে সেনটার হাফকে পিছনে ফেলে ছুটে গিয়ে (CF2) -এর জায়গায় পেঁাছেই বল না থামিয়ে গোলে শট নেবার অনুশীলন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সেনটার হাফও যেন সেনটার ফরোয়ার্ডকে গোলে কিক নিতে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে।
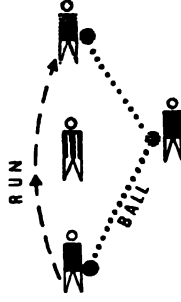
এই ছবিতে দুজন বিপক্ষের বিরুদ্ধে গোলে কিকিং অনুশীলনের দৃষ্টান্ত দেখানো হচ্ছে। সম্পূর্ণ কালো ইউনিফর্ম পরা ফুটবলার স্বপক্ষের কাছে বলটি ঠেলে দিয়ে, বিপক্ষের ডান দিক দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে। স্বপক্ষের খেলোয়াড়টি সেই বলটিকে দ্বিতীয় বিপক্ষের খেলোয়াড়টির পাশ দিয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখন প্রথম খেলোয়াড়টি নিজের গতি একটুও না কমিয়ে ঐ চলন্ত বলের ওপরই গোলে কিক করবার অনুশীলন করতে পারে। বিপক্ষের দুজন খেলোয়াড়ই এখানে তাদের সাধ্যমত নিশ্চয় গোলে শট না নিতে দেবার চেষ্টা করবে।

এই ছবিটিতে দেখানো হচ্ছে, কালো ইউনিফর্ম পরা খেলোয়াড়টির পায়ে বল থাকলেও, অন্য স্বপক্ষের খেলোয়াড়টিকে সামনাসামনি কড়া পাহারায় রেখেছে বিপক্ষের একজন খেলোয়াড়। তাকে বল ঠেলতে গেলেই বিপক্ষের খেলোয়াড়টি খুব কাছে থাকায় সে বল ছিনিয়ে নিতে পারে। এখানে দেখানো হচ্ছে, বল-ছাড়া খেলোয়াড়টি হঠাৎ তীব্র গতিতে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পায়ে বল-থাকা খেলোয়াড়টি, দ্বিতীয় বিপক্ষের খেলোয়াড়টির পাশ দিয়ে বলকে সামনের দিকে ফাঁকা জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে যাতে তার স্বপক্ষের খেলোয়াড় ঐ ফাঁকা জায়গায় ঐ চলতি বলেই গোলে কিক নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিপক্ষের দুজন খেলোয়াড় প্রাণপণে চেষ্টা করবে যাতে সহজভাবে কালো ইউনিফর্ম পরা ফুটবলার গোলে কিক না নিতে পারে।
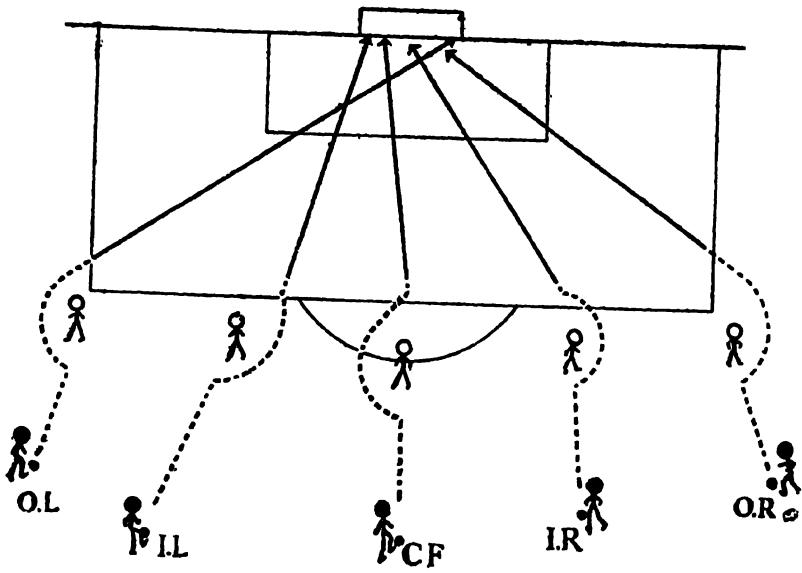
এই ছবিতে পাঁচ ফরোয়ার্ডের তাদের নিজস্ব পজিশন থেকে চলতি বলে বিপক্ষকে কাটিয়ে গোলে কিকিং অনুশীলনের একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। কালির ডট্-ডট্ দেওয়া অংশটুকুতে ফরোয়ার্ডের বল নিয়ে ছোটার এবং যেখানে এটি শেষ হচ্ছে সেইখান থেকে গোলে কিক্ করার অংশটুকু দেখানো হচ্ছে।

স্ক্রীনিং

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেমস অভ্যাসের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "ম্যান ইজ এ ওয়াকিং বান্ডল অব হ্যাবিটস্।" অর্থাৎ মানুষ কতকগুলো অভ্যাসের চলমান সমষ্টি। এ মন্তব্যের হয়ত অনেকটাই সত্য, কিন্তু এই অভ্যাস বলতে ফুটবলার যেন শুধু আচরণমূলক অভ্যাসটুকুই না বোঝে। কেননা, এ ছাড়াও আরো দু'রকমের অভ্যাস রয়েছে—চিন্তনের অভ্যাস এবং ইচ্ছার অভ্যাস, যা ফুটবলের মত সৃষ্টিশীল খেলায় নিঃসন্দেহে ফুটবলারের প্রথমেই দরকার। কেন না চিন্তন প্রক্রিয়ার ওপর যার নিয়ন্ত্রণ বা দখল নেই তার খেলা এলোমেলো হতে বাধ্য। তাই খেলা কিংবা অনুশীলনের সময়তেও ফুটবলারকে এই চিন্তন-অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে, এবং এতে সাফল্য লাভ করলে দেখা যাবে, কোন রকম প্রয়াস এবং মনোযোগ ছাড়াই তার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব হচ্ছে।

১ নম্বর

সাধারণ ফুটবলার যেখানে বল পাবার পর চিন্তা করতে শুরু করে কোন দিকে সে যাবে বা কাকে বল দেবে, জাত-খেলোয়াড়েরা সেখানে বল পাবার অনেক আগেই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ইংরাজিতে একেই বলা হয় 'স্ক্রীনিং'। তাই ফুটবলার 'ট্র্যাপিং' যত ভালভাবেই শিখুক—মূল্যহীন, যদি সঙ্গে সঙ্গে তার এই 'স্ক্রীনিং'-এর ক্ষমতা না থাকে।

এক নম্বর ছবিতে 'স্ক্রীনিং'-এর একটি নমুনা দেখানো হচ্ছে। বল ট্র্যাপ করলেই বিপক্ষের ডিফেন্ডার সেই বল কেড়ে নিতে পারে—এই সম্ভাবনায় নন্ কিকিং ফুট ও সেই দিকের কাঁধ দিয়ে তাকে আড়াল করে ফেলা হয়েছে।

২ নম্বর

দুই নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে বিপক্ষের ডিফেণ্ডার ওরই ভিতর দিয়ে পা বাড়িয়ে বল কাড়তে গেছে, প্রথম ফুটবলার বলকে পায়ের তলা দিয়ে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

৩ নম্বর

তিন নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে বিপক্ষের ডিফেণ্ডারকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফুটবলার কেমন করে বল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।
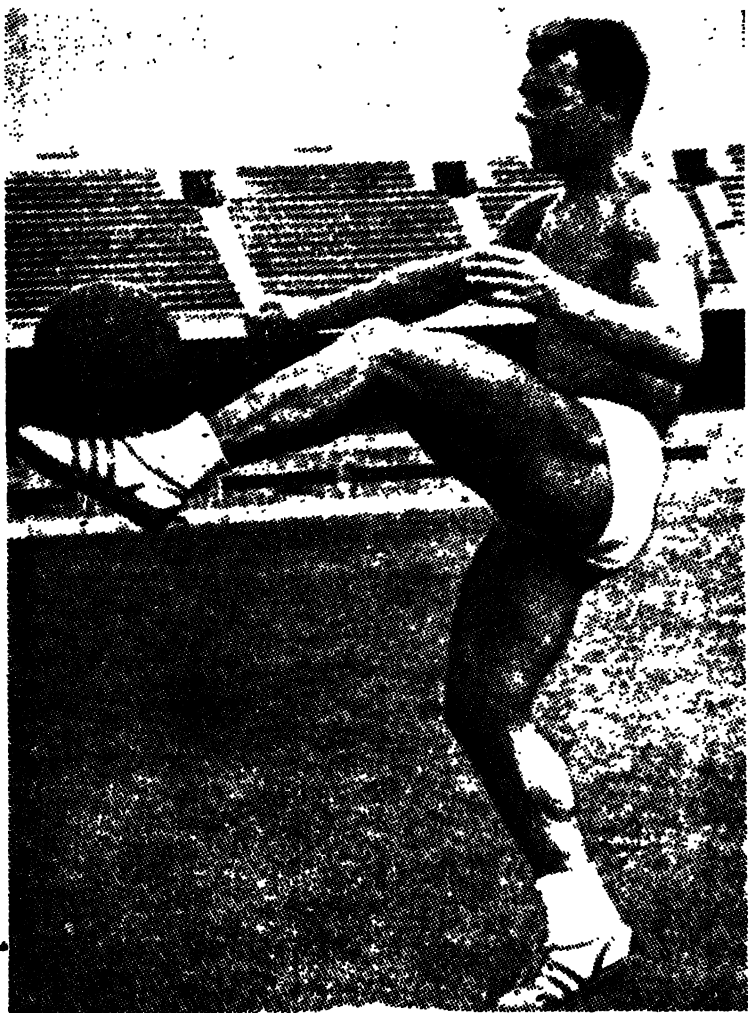
৮ নম্বর

মাথা (৭ নম্বর ছবি) ও এ্যাংকেল (৮ নম্বর ছবি) দিয়ে কণ্ট্রোল করতে করতে বলকে ঐ দুই জায়গায় স্থির করে রাখা, ফুটবলারের বল-কণ্ট্রোল ক্ষমতার সর্বোচ্চ পরিচয়। ফুটবলার অনুশীলনে নিজেই এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

হেডিং

আজকের ফুটবলে যে-কোন খেলোয়াড়, গোলকীপার থেকে লেফট্ আউট পর্যন্ত, কারোরই এলোপাথাড়ি বল কিক্ করাই অনুচিত' তা নয়, বিনা প্রয়োজনে মাটি থেকে বল শূন্যে তোলাও নিষিদ্ধ। কেননা, বল ওপরে উঠলেই খেলার গতি

শ্লথ হয়, নীচু বলের তুলনায় স্বপক্ষের খেলোয়াড়দের উ'চু বল ট্র্যাপ করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষের ফুটবলাররা বলের দিকে সোজাসুজি মুখ করে আছে বলে হেড করে সে বল বার করে দেবার সুযোগও বেশী পায়। কাজেই হেডিং-এর সুযোগ আগের তুলনায় আজকের ফুটবলে কমে গেলেও হেডিং-এর প্রয়োজনীয়তাটুকু কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি। বরঞ্চ আগের তুলনায় আজকের হেডিং নিঃসন্দেহে আরও কঠিন এবং দুরূহ হয়েছে। কেননা, এলোপাথাড়ি না মেরে বিপক্ষের ফুটবলার যদি বলকে মেপে চীপ বা লব করে, তা হলে সেই বলকে হেড করা যেমন কঠিন, তেমনি বিপক্ষের গোলমাউথে ইচ্ছে কর সৃষ্টি করা দেওয়ালের মাঝ থেকে ঝাঁপিয়ে হেড করে গোলকীপারকে ফাঁকি দেওয়া নিঃসন্দেহে আরও শক্ত।

'হেডিং' অনুশীলনের আগে ফুটবলারকে মনে রাখতে হবে, হাঁকপাঁক না করে স্থির মস্তিষ্কে বলের সঞ্চরণ গতি, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'ফ্লাইট', পর্যবেক্ষণ করা এবং দু' পায়ে এবং এক পায়ে যথেষ্ট উ'চুতে লাফাবার ক্ষমতা এবং মাথার সঠিক জায়গা দিয়ে হেড করা।
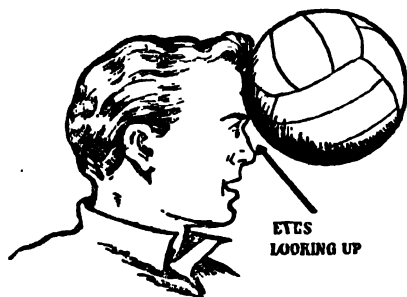
(১)

১ নম্বর ছবিতে কপালের কোন অংশ দিয়ে সামনাসামনি হেড করতে হবে তাই দেখানো হচ্ছে এবং এ সময়ে সর্বদাই চোখ খুলে রাখতে হবে। ফুটবলার যেন কোন সময়েই মাথার ব্রহ্মতালু দিয়ে হেড না করে। কেননা এতে ব্রেণ কন্‌কাশন হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। যে সমস্ত ফুটবলার হেডিং-এ ভয় পায়, তাদের ব্লাডার কিংবা রাবারের বল দিয়ে প্রথমে কিছুদিন অনুশীলন করলে এই ভয়টা কেটে যাবে।

(৪)

(৫)

চার এবং পাঁচ নম্বর ছবিতে পায়ের ইনসাইড ও আউটসাইড দিয়ে বল ঘোরানর কায়দা দেখানো হচ্ছে।

ছয় নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে ক্রীকেটের ষ্ট্যাম্প পুঁতে বলকে ইনসাইড ও আউটসাইডের অনুশীলন

পাসিং ও ইণ্টার পাসিং

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ভারতীয় ফুটবলকে এ দেশের প্রায়-লুপ্ত একান্নবর্তী পরিবারের সংগে তুলনা করা যায়। সেখানে যারা উদয়াস্ত খেটে রোজগার করতেন আর যারা খোশগল্প ছাড়া কিছুই করত না, তারা একত্রে একই সংসারের ছত্রছায়ায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতেন। পুরো পরিবারের দায়দায়িত্ব, ভাবনা-চিন্তা বর্তাতো সংসারের প্রবীণ কোন এক কর্তার ওপর। তাঁরই ত্যাগ-তিতিক্ষায় এবং ব্যক্তিত্বে সংসারটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু আধুনিক কালের আমরা বলছি যে, কোন ব্যক্তিত্বই যেমন ফেলনা নয় বা তাকে ছেঁটে ছোট করারও দরকার নেই, তেমনি কোন ব্যক্তিত্বের মহিমার আড়ালে অন্য অনেকগুলো লোকের অলস-তাকে প্রশ্রয় দেওয়াও আধুনিকতা বিরোধী। আসলে মানুষকে পুরোপুরি দেহে এবং মনে খাটিয়েই তার সম্ভাবনার পরিমাপ সম্ভব। আধুনিক ফুটবলের দুটি মূল লক্ষ্য। গোল করা এবং গোল না খাওয়া। খেলাকেও আজ তাই তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) আক্রমণ, (২) প্রতিরক্ষা এবং (৩) মধ্য মাঠের খেলা। একটা দলের গোলকীপারকে বাদ দিয়ে বাকী দশজনকে প্রয়োজনমত এই তিনটে কাজেই আজ যোগ দেবার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। শুধু বিপক্ষের কোন একজনকে গার্ড দিয়েই বা বল পায়ে পেলে দু' তিনজনকে ড্রিবল করে একটা থ্রু বাড়িয়ে দিয়ে অথবা গোলের সামনে সারা খেলাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে গোলে তিন চারটে কিক করেই কোন ফুটবলারের কর্তব্য ঐখানেই আজ আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

এই যে দশজনের সাধ্যের শেষ সীমার মিলিত প্রয়াস, যাকে যৌথচেতনা বলা যেতে পারে, যা শুধু আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই এর অভাব ছিল, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আজকের আধুনিক ফুটবলে। এবং এর পরিপূর্ণ সাফল্য নির্ভর করবে পূর্ণ ফুটবলার হয়ে ওঠার সাধনায় ও পরিপূর্ণ বিকাশে এবং এই দশজনের ভেতর বল দেওয়া-নেওয়া করে বিপক্ষের গোলে বল ঢুকিয়ে দেওয়ায়।

'পাসিং ও ইণ্টারপাসিং' আক্রমণ রচনার মূল স্তম্ভ। এবং এ ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভুল হতে হবে—তা পা দিয়েই হোক, অথবা মাথা দিয়ে পাসিং-এ স্বল্প কিংবা বেশ খানিকটা দূরত্বের মাটিঘেঁষা অথবা শূন্যের বলে। এ যদি না হয়, তা হলে আক্রমণ রচনার সব ধরনের কৌশলই বিফল হতে বাধ্য। যার পায়ে বল তার যেমন নিখুঁত পাস করবার দক্ষতার প্রয়োজন, ঠিক সেই পরিমাণেই দলের অন্য ফুটবলারেরও সে বল নেবার জন্য নিজেদের ফাঁকা জায়গায় নিজেকে নিয়ে যাওয়া দরকার। না হলে নিখুঁত পাসিং-ও সম্ভব নয়।

ফুটবলার তার নিজস্ব ক্রীড়া নৈপুণ্য বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমেই বাড়াতে পারে এবং তার মেজাজে খাপ খেয়ে যায় সেই অনুযায়ী এ বিষয়ে তার হয়ত নিজস্ব কোন মতও গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু কোন টীমের 'পাসিং ও ইনটার পাসিং'-এ নিখুঁত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠতে হলে এ জাতীয় ব্যক্তিগত অথবা তার ভালো-লাগা, না-লাগার কোন মূল্যই নেই—উপরন্তু সে টীমের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর।

উঁচু ক্লাসে উঠে তখন সবে সাইকেল চালান শিখছি কিন্তু কিছুতেই সাইকেলে

রাস্তা পার হবার সাহস হয় না। এমন কি পিছন থেকে মোটরের হর্ন শুনলেই তরতারিয়ে সাইকেল থেকে মাটিতে নেমে পড়ি। যে বন্ধু আমাকে শেখাত সে রোজ আশ্বাস দিত, "ঘাবড়াস না—কিছুদিন পর দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।" শেষে এমন হল, শব্দ থেকেই টের পেতাম পিছন থেকে গাড়ি আসছে কিনা—ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে রাস্তা পার হবারও দরকার পড়ত না।

এই যে বিশেষ অনুভূতি তা নিঃসন্দেহে সুদীর্ঘ অনুশীলন-সাপেক্ষ; তবে একশো জনের ভিতর নিরানব্বই জনই এর অধিকারী হতে পারে।

পাসিং ও ইনটারপাসিং যতই উন্নত ধরনের হোক না কেন, তা এক জাতীয় ড্রিল ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে ড্রিলে চিন্তা বা বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই কিন্তু এখানে নজরটা দু দিকে রাখতে হয় বলে ফুটবলারের চিন্তা বা বুদ্ধির বিকাশের কিছুটা প্রয়োজন আছে। প্রথমত, বল পাবার আগেই সারা মাঠে তাকিয়ে ফুটবলারকে ভেবে নিতে হয় যে, সে বল পেলে কি করবে। দ্বিতীয়ত, বল পাস করবার সময় তার পুরোপুরি দৃষ্টিটা থাকবে বলের ওপর। এই যে একবার বল থেকে মাঠে এবং মাঠ থেকে বলে 'চকিত প্রেক্ষণ', যাকে বলা হয় 'স্প্লিট গ্লান্স' তাও যে-কোন দেশের যে-কোন ফুটবলার সুদীর্ঘ অনুশীলনে আয়ত্তে আনতে পারে।

পাসিং ও ইনটারপাসিং-এর আর একটি যে বড় সমস্যা সেটি হল ফুটবলারের জায়গা-বদল। যেমন ধরা যাক, একজন উইং হাফ আক্রমণের সময় জায়গা বদল করতে করতে বিপক্ষের গোল এরিয়ার ভিতর ঢুকে পড়েছে এবং এমন সময় সেখানে সে বল পেয়েছে যে, দ্রুত তীব্র শটে গোলকীপারকে পরাজিত করা ছাড়া তার অন্য কিছু করণীয়ও নেই। এখন এ সময়ে তার যদি শুটিঙ-এ দক্ষতা না থাকে, তা হলে জায়গা বদল করবার মুখ্য উদ্দেশ্যটাই পুরোপুরি ভেস্তে যাবে। **কাজেই ফুটবলারকে মনে রাখতে হবে, জায়গা বদল করা এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু এই জায়গা বদল করতে করতে প্রতিনিয়ত তাকে যে জায়গায় যেতে হচ্ছে, সেই জায়গা অনুযায়ী খেলা সত্য করে খুবই শক্ত। তাই আধুনিক ফুটবলে প্রত্যেক ফুটবলারকেই সার্বিক-ফুটবলার হয়ে ওঠবার বিশেষ আছে।**

'পাসিং ও ইনটার পাসিং'-এর এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ 'মুভ' নেই যা করলেই গোল হবে। আবার শুধু দু-একটা মুভে পারদর্শী হয়ে উঠলেও বিপক্ষের বুদ্ধিমান ডিফেন্ডারদের ফাঁকি দিয়ে গোল করা মোটেই সহজ নয়। কেননা এ'কে কাটাবার মত 'ছক' তাদেরও জানা থাকতে পারে। কাজেই অনেকগুলি মুভে নিপুণভাবে রপ্ত হওয়া ও সেইগুলোকে খেলার প্রচণ্ড গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত প্রয়োগ করার মত বুদ্ধি ও কৌশলই ফুটবলারের মূল কাম্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেকটি 'মুভ' যতক্ষণ টীমের প্রত্যেকটি ফুটবলার বুঝতে এবং সাফল্যের সঙ্গে তাকে খেলায় প্রয়োগ না করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত টীমের সব খেলোয়াড়কেই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেটি অনুশীলন করে যেতেই হবে। যে ফুটবলারের গ্রহণ-ক্ষমতা খুব তাড়াতাড়ি সে যদি বিরক্ত হয়ে ওঠে দেরীতে গ্রহণ-সম্পন্ন ফুটবলারের ওপর, তাহলেও এ বিষয়ে সে টীমের সাফল্য লাভ এক কথায় অসম্ভব।

এই 'পাসিং ও ইনটার পাসিং' শুরু করতে হবে খুব ধীর পদক্ষেপে—হেঁটে হেঁটে করলেও আপত্তি নেই। খালি এই সময় নজর রাখতে হবে, প্রত্যেকে প্ল্যান-

মাফিক জায়গা বদল করছে কি না। ধীর পদক্ষেপ থেকে গতিকে বাড়িয়ে দ্রুত করতে হবে এবং প্রত্যেক 'মুভ' শেষ হবে গোল করবার জন্য গোলে 'শুটিং'-এর চেষ্টা করে। এরপর বিপক্ষ হিসেবে কিছু খেলোয়াড়কে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে! এ ক্ষেত্রে তাদের কাজ হবে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকা—বাধা দেবার কোন চেষ্টাই তারা করবে না। এবং এই সব খেলোয়াড় ডিফেন্সের হলেই ভাল হয়। এই যে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা না করা, একেই বলা হয় 'প্যাসিভ রেসিস্টেন্স'। এই 'প্যাসিভ রেসিস্টেন্সে' রপ্ত হয়ে গেলে শুরু করতে হবে 'অ্যাক্টিভ রেসিস্টেন্স'-এ রপ্ত হবার। অর্থাৎ যারা বাধা দেবার কোনরকম চেষ্টাই করেনি—শুধু দাঁড়িয়ে ছিল, তারাই এবার বাধা দেবার এবং বল কেড়ে নেবার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবে। এই সময় নজর রাখতে হবে বিপক্ষের খেলোয়াড় যেন একজন কম থাকে অর্থাৎ তিনজনে যখন 'মুভ' করছে, বিপক্ষের খেলোয়াড় থাকবে দুজন। চারজন হলে তিনজন।

(১) (২)

এক নম্বর ছবিতে 'ডাইরেক্ট পাশের' নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। ক এখানে খ-এর পায়ে সিধেসিধি বল ঠেলে দিচ্ছে, একে 'স্কোয়ার পাশ'ও বলা হয়

দুই নম্বর ছবিতে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বল নেওয়ার নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। একে বলা হয় —'মুভিং ইনটু এ্যান ওপেন স্পেস'

ক এখানে বল ঠেলছে খ-কে। যদি সিধেসিধি খ-এর পায়ে বল ঠেলা হয়, তাহলে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা বিপক্ষের গ সে বল ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে বা যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন খ যদি খ১, খ২, খ৩ কিংবা খ৪-এর ভেতর যে কোন ফাঁকা দিকে ছোটে এবং ক যদি সেই দিকে বল দেয় তা হলে কিন্তু বিপক্ষের গ-এর সে বল কেড়ে নেওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

(৩)
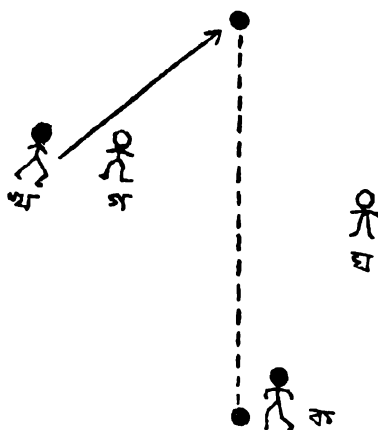
তিন নম্বর ছবিতে থ্রু পাশের নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। ক এখানে বিপক্ষের গ এবং ঘ-এর মাঝখান দিয়ে বল ঠেলে দিচ্ছে এবং ঘ তীর চিহ্নিত জায়গার ওপর দিয়ে দৌড়ে সে বল নিচ্ছে। দুই বা ততোধিক খেলোয়াড়ের ফাঁক দিয়ে বল পাস করাকেই থ্রু পাস বলা হয়।
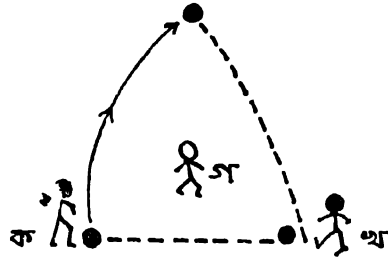
(৪)

চার নম্বর ছবিতে যে পাশ দেখানো হচ্ছে তাকে বলা হয় 'ওয়াল পাশ'। ছোটবেলায় যারা পাঁচিল দেওয়া ছোট জায়গায় ক্যাম্বিস বা রাবার বল খেলে অভ্যস্ত তারা এ জাতীয় পাশের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। বিপক্ষকে ড্রিবল না করে স্রেফ দেওয়ালে মেরে বল নিয়ে যাওয়া থেকেই এ পাশের উদ্ভব এবং এর নামটাও নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে। ক খ-কে বল ঠেলে বিপক্ষের গ-এর পাশে তীর চিহ্নিত জায়গায় দৌড়বে এবং খ-এর কাজ হবে ঐ চলতি বলকেই শুধু সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া।
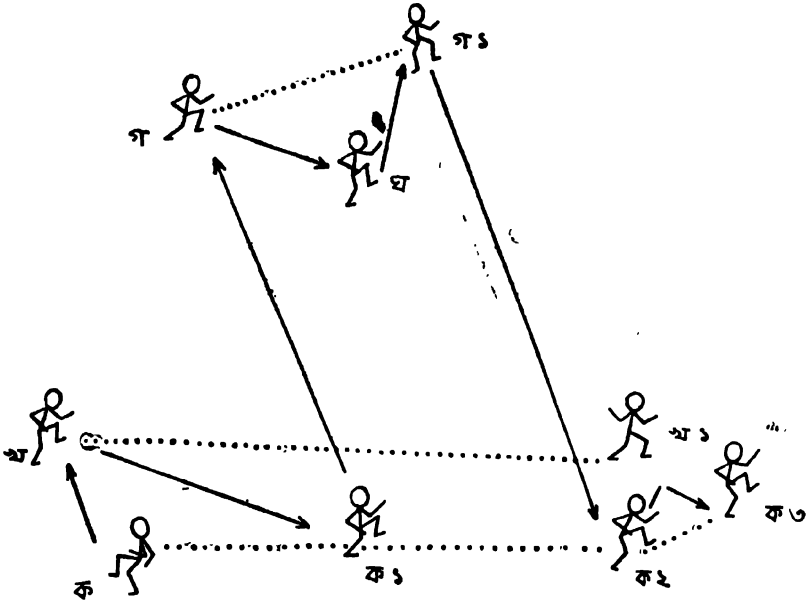
(৫)

পাঁচ নম্বর ছবিতে চারজনের পাসিং ও ইনটার পাসিং-এর একটি নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে। ক খ-কে বল দিয়ে ক-১-এর জায়গায় আসতেই খ সঙ্গে সঙ্গে সে বল ক-১-কে ঠেলে দিচ্ছে এবং খ-১-এর জায়গায় দৌড়চ্ছে। ক-১ সে বল এবার উঁচু করে গ-কে ঠেলে দিয়ে ক-২-এর জায়গায় দৌড়চ্ছে। গ সে বল ঘ-কে ঠেলে গ-১-এর জায়গায় দৌড়চ্ছে। গ সে বল ঘ-কে ঠেলে গ-১-এর জায়গায় আসতেই ঘ সঙ্গে সঙ্গে সে বল গ-১-কে দিচ্ছে। গ-১ এখন ক-২-কে উঁচু করে পাস দিচ্ছে। ক-২ এখানে আগের মতন খ-১-কে বল ঠেলে ক-৩-এর জায়গায় গিয়ে সে বল খ-১-এর কাছ থেকে পাস নিচ্ছে। এ ধরনের 'মুভ' কমপক্ষে চার এবং বেশী হলে ৮। ৯ জনকে দিয়েও করান যেতে পারে।
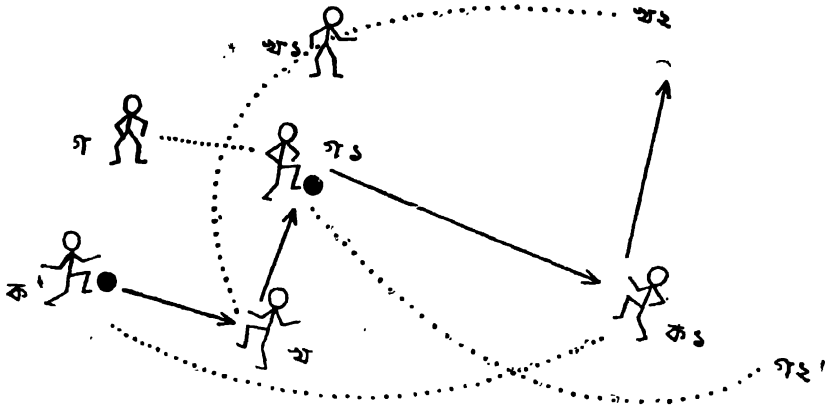
(৬)

ছয় নম্বর ছবিতে তিনজনের 'ইনটার চেঞ্জ মুভমেন্ট'-এর একটি নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে। ক, খ-কে বল ঠেলে ঘ-এর পাশ দিয়েই ক-১-এর জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঘ সে বল ক-১কে না দিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে গ-১-কে এবং তীব্রবেগে গ-১-এর পিছন দিয়ে দৌড়চ্ছে ঘ-১-এর জায়গায় এবং পরে খ-২ এর জায়গায়।

গ-১, গ-এর জায়গা থেকে বল পাবার আশায় ছুটে এসেছে এবং পেয়েছেও। গ-১ এখানে ঘ-১-কে বল না দিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে ক-১-কে। এবং এই দেবার পর সেও দাঁড়িয়ে থাকছে না। বল পাবার আশায় সেও তীব্রবেগে দৌড়চ্ছে গ-২-এর জায়গায়।

(৭) (৮)
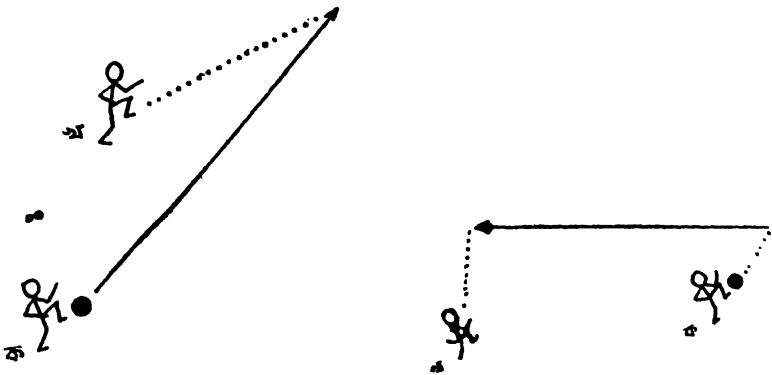
সাত নম্বর ছবিতে 'ক্রশ ওভার পাস'-এর একটি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। এ জাতীয় পাসের আগে যার পায়ে বল থাকবে (যেমন এখানে ক) তাকে গোড়াতেই দেখে নিতে হবে যে, অন্য খেলোয়াড়—এখানে খ) ফাঁকা জায়গায় বল নেবার জন্য কোনদিকে দৌড়চ্ছে, এবং সেই বুঝে তার পদক্ষেপের ঠিক সামনে বল রাখতে হবে। এই জাতীয় পাসিং অনুশীলনের সময় ক এবং খ-এর দূরত্ব থাকবে কমপক্ষে ৩০ গজ।

আট নম্বর ছবিতে 'রিভার্স পাসিং'-এর দুটি নমুনা দেওয়া হয়েছে। ক এখানে ডট ডট দেওয়া লাইন ধরে বল নিয়ে যেতে যেতে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে খ-কে সে বল বাড়িয়ে দিচ্ছে। খেলা একপেশে হয়ে গেলে তাকে অন্যদিকে অর্থাৎ ফাঁকা দিকে ঘোরাবার জন্য কিংবা বিপক্ষকে ধোঁকা দেবার জন্য একদিকে গিয়ে গিয়ে অন্যদিকে পাস দেওয়াকেই 'রিভার্স পাসিং' বলা হয়।
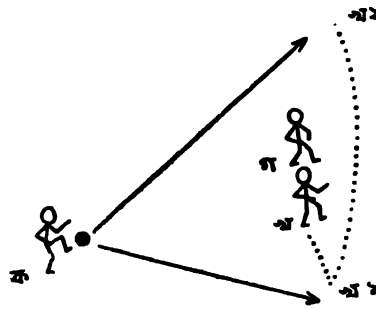
(৯)

নয় নম্বর ছবিতে 'ডবল রানিং' পাসের একটি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। বিপক্ষের খেলোয়াড় যখন গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তখন তাকে বলা হয় 'ম্যান-টু ম্যান' অথবা 'মার্কিং প্রসেস'। যেমন এখানে খ-এর বিপক্ষ গ গায়ে গায়ে লেগে আছে, যাতে ক, খকে বল ঠেললেই সে বল গ ছিনিয়ে নিতে পারে। এখন খ-এর উচিত ক-এর কাছে থেকে বল নেওয়ার জন্য পিছনে খ১-এর জায়গায় নেমে আসা। এতে ক অনায়াসে তাকে বল দিতে পারবে। আর গ-ও যদি খ-এর সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে, তাহলে খ১ এবং খ২-এর মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটুকু তৈরি হবে, ক সেই খ২-এর জায়গায় বল ঠেলে দিতে পারবে। এই যে পেছনে নেমে এসে আবার সামনের দিকে ছোটা অর্থাৎ দু'বার ছোটা—একেই বলা হয় 'ডবল রানিং'।
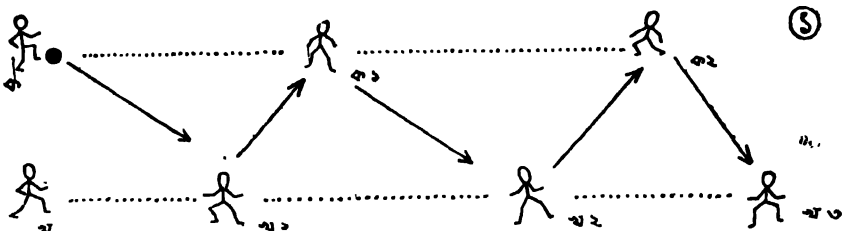
(১০)

দশ নম্বর ছবিতে দুজন ফুটবলারের পাসিং ও ইনটারপাসিং-এর অনুশীলন তুলে ধরা হচ্ছে। ক এখানে বল পাস দিচ্ছে খ-১-কে তার ডান পায়ের আউটসাইড দিয়ে অথবা বাঁ পায়ের ইনসাইড দিয়ে। খ খানিকটা ছুটে খ-১-এর জায়গায় পেঁাছে বাঁ পায়ের আউটসাইড দিয়ে অথবা ডান পায়ের ইনসাইড দিয়ে বলকে ট্র্যাপ করে সঙ্গে সঙ্গে ক-এর মতই যে-কোন পায়ে ক১-এর কাছে ঠেলে দিচ্ছে। এ অনুশীলনের সময় ফুটবলারের দু পায়েই বল ট্র্যাপ এবং বল ছাড়া অভ্যাস করা উচিত।
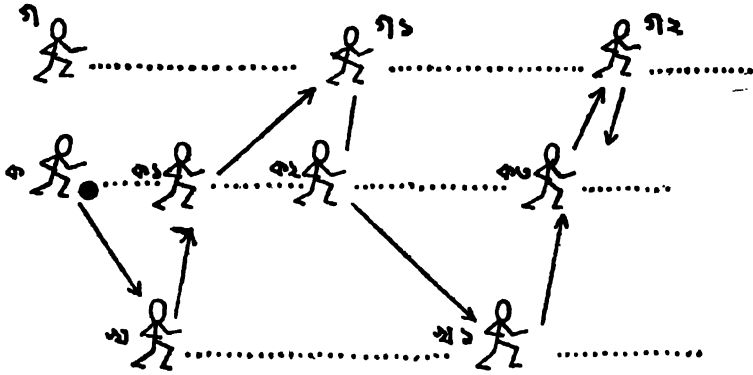
(১১)

এগার নম্বরের অনুশীলনের ছবি এক নম্বরেরই পালটি। পাসিং যাতে একমুখীন না হয় অর্থাৎ ফুটবলার যাতে তার দুই দিকেই পাস করতে পারে তারই অনুশীলনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ক এখানে মুখ্য খেলোয়াড়। প্রথমে সে বল ঠেলছে খ-কে। খ সঙ্গে সঙ্গে সে বল ক১-কেই ফেরত দিচ্ছে। ক১ এবার খ-কে না দিয়ে বল ঠেলে দিচ্ছে গ১-কে। এইভাবে দু দিকেই বল দেওয়া অনুশীলন করলে খেলার সময় আক্রমণে বিশেষ সহায়তা করবে।
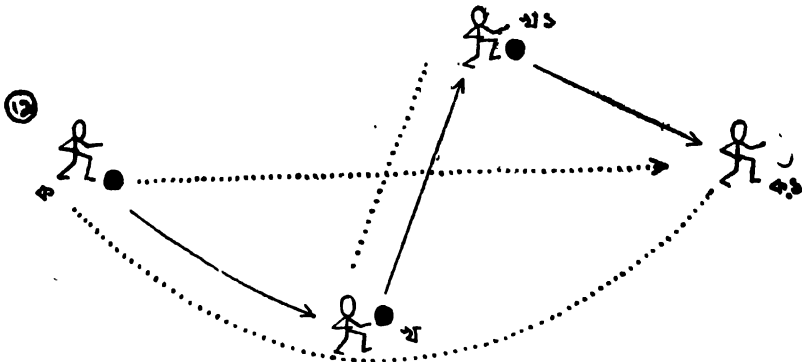
(১২)

বারো নম্বর ছবিতে জায়গা বদল করে পাসিং অনুশীলনের একটি নমুনা দেখান হচ্ছে। ক খ-কে বল ঠেলে খ-এর দিকেই ডট-ডট লাইন ধরে ছুটছে। খ সে বল নিয়ে ছুটে খ১-এর জায়গায় পোঁছে ক১-কে বল ঠেলে দিচ্ছে। ক-কে খ-এর পিছন দিক হয়ে ক১-এর জায়গায় পোঁছে এ-জাতীয় পাস নিতে হলে নিঃসন্দেহে তাকে তীব্রভাবে ছুটতে হবে।

(১৩)
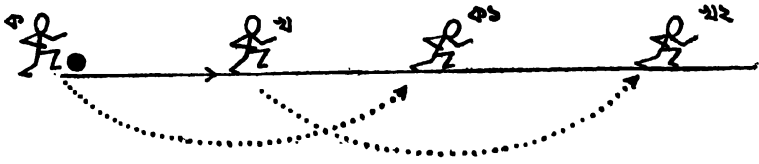
তেরো এবং চোদ্দ নম্বর ছবিতে ‘ওভারল্যাপিং’ পাসের দুটি নমুনা দেখানো হচ্ছে। ক এখানে খ-এর কাছে বল ঠেলে ডট-ডট লাইন দিয়ে ছুটে ক১-এর জায়গায় আসছে। খ-ও অনুরূপ ক১-এর পায়ে বল দিয়ে ডট-ডট লাইন ধরে ছুটে খ২-এর জায়গায় যাচ্ছে।
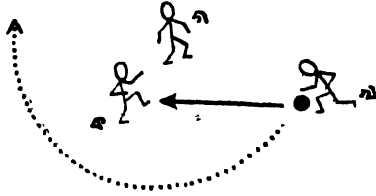
(১৪)

খ এখানে ক-এর পায়ে বল ঠেলে সামনে বিপক্ষের গ থাকায় ক-এর পিছন দিক থেকে তীরচিহ্নিত ফাঁকা জায়গায় ছুটছে যাতে ক অনায়াসে তাকে ঐ বল ঠেলে দিতে পারে।

(১৫)
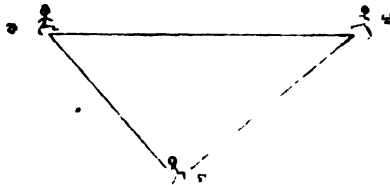
পনেরো নম্বর ছবিতে ‘ট্র্যাংগুলার’ পাসের একটা নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। ক, খ এবং গ ত্রিভুজ আকৃতি করে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে বল পরস্পরের ভেতর আদান-প্রদান করতে হবে। এবং প্রত্যেকেই বল ট্র্যাপ করেই তবে বল ছাড়বে। ক্রমশ বল ট্র্যাপ না করেই চলতি বলেই পাস করবার চেষ্টা করবে। এবং বলের গতিকে নির্ভুল পাসের সাহায্যে ক্রমশ যতটা পারা যায় বাড়িয়ে তুলতে হবে।

কে কোন পোজিশনে খেলবে

দুটো দল করে বাইশজন ছেলের মাঝে (ফুটবল খেলায় তেমন অভ্যস্ত নয়) একটা ফুটবল যদি ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে—ঐ বাইশজনের ভিতর সবাই বিভিন্ন ভাবে খেলছে। সবাই যখন পা দিয়ে বলকে মারছে, দু-একজন হাত দিয়ে বল ধরবার জন্য গোলপোস্টে দাঁড়িয়েছে।

অধিকাংশ ছেলেদেরই স্বভাব বল পেলে সেখানে কিছুতেই ছাড়তে চাইবে
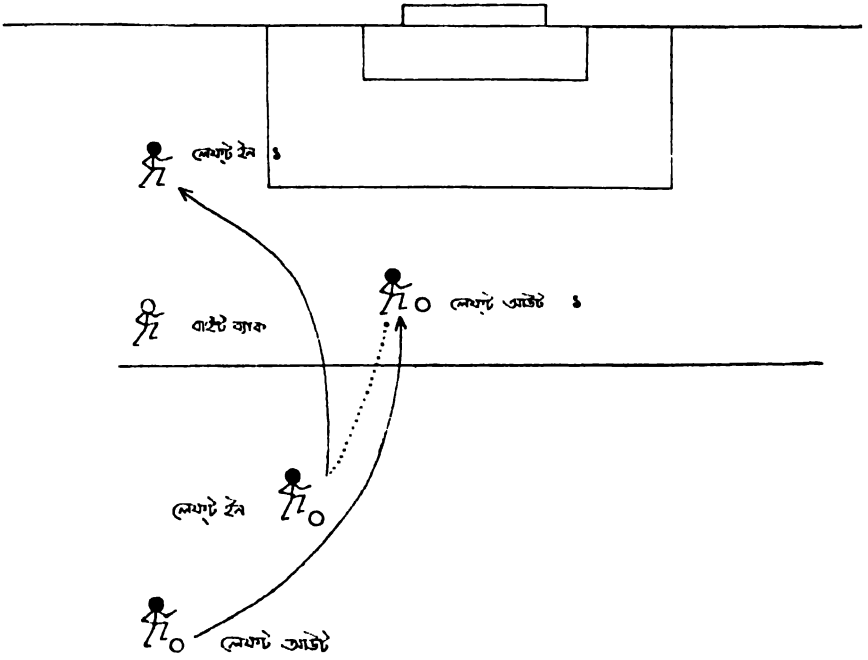
ছয় নম্বর ছবি

জোনাল ফুটবলের পরে পৃথিবীময় যখন ম্যান-টু-ম্যান অথবা মার্কিং ফুটবল সাফল্য লাভ করল, তখন ফুটবলের আক্রমণ বিভাগটাই বন্ধ্যা হয়ে ওঠবার উপক্রম হল। কিন্তু যে মানুষ অন্য মানুষকে ধ্বংস করবার জন্য অ্যাটম বোম তৈরী করে, তাকেও আবার অ্যাটম বমের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই গবেষণা শুরু করতে হয়। কাজেই এখানেও যে কোচেরা গোল খাব না বলে মার্কিং প্রসেসের সৃষ্টি করে উল্লসিত হয়েছিল, তাদেরই আবার ভাবতে হল—কি করে একে ভাঙা যায়। আর তখনই শুরু জায়গা বদল করে আক্রমণ পদ্ধতির। এই ছয় নম্বর ছবিতে তারই একটি নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে। মার্কিং প্রসেস অনুযায়ী রাইট ব্যাকের কর্তব্য হল বিপক্ষের লেফট আউটকে পুরোপুরি বল ছুঁতে না দেওয়া। এখন লেফট আউট যদি তার নিজের ব্যাক এরিয়ায় বল ধরে তাহলে রাইট ব্যাক হিসেবে সে কি করবে? সে কি অতদূর উঠে যাবে? উঠে গিয়ে যদি সে ঠিকমত বল না কাড়তে পারে, তাহলে তার ফেলে আসা জায়গায় যদি বিপক্ষের কোন ফরোয়ার্ড ঢুকে পড়ে তাহলে কোন মানুষের পক্ষে কি অতদূর ছুটে এসে গোল বাঁচান সম্ভব অথবা বল কেড়ে নেওয়া! আবার দেখা যাক লেফট আউট বল লেফট ইনকে দিয়েই সেনটার ফরোয়ার্ডের জায়গায় চলে গেল। এবং লেফট ইনও সে বল আবার লেফট আউটকে দিয়েই (লেফট ইনের) লেফট টাচ্ লাইনের দিকে চলে গেল। এখন এই জায়গা বদলের মাঝখানে পড়ে রাইট ব্যাকের কর্তব্য কি?, যদি সে মার্কিং প্রসেস অনুযায়ী লেফট আউটের পিছন পিছন ছুটে নিজের জায়গা ছেড়ে মাঝখানে চলে যায় তাহলে লেফট ইন গোল করে দেবে। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে মার্কিং প্রসেস কোন এক সময়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করলেও, যেদিন থেকে এই জায়গা বদল করে আক্রমণ রচনা শুরু হল সেদিনই তার সমাধি রচনা হল। এমন অবস্থায় রাইট ব্যাকের করণীয় হবে, তার বিশেষ জোন ধরে খেলা এবং এই জোনের ভেতর যে খেলোয়াড়ই ঢুকে পড়ুক, তার কাছ থেকে বল কেড়ে নেবার চেষ্টা করা। অর্থাৎ জোন এবং মার্কিং প্রসেসের যুক্ত প্রয়োগ।

উইং ব্যাক

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ ফুটবলকে নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকায় বিশেষ পজিশনের জন্য নির্দেশনার লাইন টেনে দেওয়া শুধু যে শক্ত তাই নয়—অনুচিতও বটে।

এই প্রসঙ্গে উইং ব্যাকের কথাই ধরা যাক। থার্ড ব্যাকের আগে যখন 'জোনাল সিস্টেমে' খেলা হত—ব্যাকের সঙ্গে বিপক্ষের উইঙ্গারের বিশেষ সম্পর্ক থাকত না। সাইড হাফই সেদিন বিপক্ষের উইঙ্গারকে আটকাবার দায়িত্ব পালন করত। সেদিন উইঙ্গারের কর্তব্য ছিল দ্রুতবেগে ফ্ল্যাগের কাছে পেঁছে উঁচু করে সেনটার তোলা। ক্বচিৎ কখনো এই উইঙ্গাররা হাফ ব্যাককে কাটিয়ে ভেতর দিকে ঢোকবার চেষ্টা করলে ব্যাক তাদের প্রতিরোধ করত। ম্যান-টু-ম্যান প্রথা চালু হলে উইং হাফ বিপক্ষের ইনসাইডকে এবং ব্যাকের সম্পূর্ণ কর্তব্য পড়ল বিপক্ষের উইঙ্গারকে আটকানোর এবং তখনই ব্যাকের খেলার ধরনই গেল পাল্টে। বিপক্ষের তীব্রগতিসম্পন্ন আউটকে আটকাবার জন্য ব্যাকের কাছ থেকে তখন সব কোচই যেটা প্রথমেই চাইলেন—সেটা হোল তীব্রগতি। আঙ্গিকের সেই ভাঙা-গড়ার লগ্নে, যে সমস্ত ব্যাকেরা ছিল ধীরগতিসম্পন্ন তারাই পড়ল ফাঁপরে। ওরই ভেতর কেউ স্টপারে নিজেদের মানিয়ে নিল, অন্যেরা খেলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এ শুধু যে অন্য দেশের ছবি তাই নয়—এ আমাদের দেশেরও বটে। এদিকে শুধু বিপক্ষের উইংকে পাহারা দিয়ে একটা ফুটব্যাকের কর্তব্য ফুরিয়ে যাওয়ার বা খেলোয়াড় জীবনের ইতি টানার কালও কিন্তু বেশী দিন রইল না। বিপক্ষের চার ফরোয়ার্ডকে সামলাতে ইতিমধ্যে চার ব্যাক প্রথার চালু হল। এতে যেমন ঘর সামলাবার দায় থেকে খানিকটা মুক্তি পাওয়া গেল, তেমনি ফুটবলের আসল জিনিস—আক্রমণ করে গোল করার সংখ্যাটাও ক্রমশ কমতে শুরু হল। চারদিক থেকে রব উঠল, খেলা ভীষণ ডিফেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে—এর প্রতিবিধান হোক। আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর এতে বলি হোল আবার সেই উইং ব্যাকই। আক্রমণ তীব্র করতে হলে চাই সংখ্যা বাড়ানো। দেখা গেল 'ডিপ ডিফেন্স'কে ভেঙে না দিয়ে—উইং ব্যাককে আক্রমণের দিকে ঠেলে দিলে আকাঙ্ক্ষিত সব জিনিসই পাওয়া যায়। এতদিন ধরে যেসব উইং ব্যাক বিপক্ষের উইঙ্গারকে আটকেই সুখী ছিল—তাদেরকে বলা হোল এগিয়ে গিয়ে আক্রমণে সাহায্য কর, প্রয়োজনে নিজের গোল লাইনে দাঁড়িয়ে গোল বাঁচাও। তার ওপর তোমার উইঙ্গার যদি তোমাকে কাটিয়ে বেরিয়ে চলে যায়—তার জন্যও দায়ী হবে তুমি। কাজেই আজকের ফুটবলে উইং ব্যাক খেলা শুধু কঠিনই নয়—যথেষ্ট অনুশীলন সাপেক্ষ ও সেই সঙ্গে তার অসাধারণ স্ট্যামিনার অধিকারীও হওয়া চাই।

কিন্তু এ তো হোল একজন উইং ব্যাককে সার্থক হতে হলে কতদূর পর্যন্ত তাকে তৈরী হতে হবে—তারই প্রতিচ্ছবি। তারও আগে তার বুনিয়াদটা কি ধরনের হবে সেই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের উইং ব্যাক রে উইলসন বলছেন, "কি ফ্যাশানের বাড়ি তৈরি করবে, সে কথা ভাববার আগে, বাড়ির ভিতের দিকে ভাল করে নজর দিও, না হলে দেখবে তোমার সব বাড়িটাই একদিন সামান্য ঝড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।" প্রশ্নঃ "ভিতটা কি?" উইলসনঃ 'ভাল ট্যাকলিঙ করতে শেখা।" আর এ ট্যাকলিঙ হওয়া উচিত ত্বরিত, পরিচ্ছন্ন এবং ফলপ্রসূ।
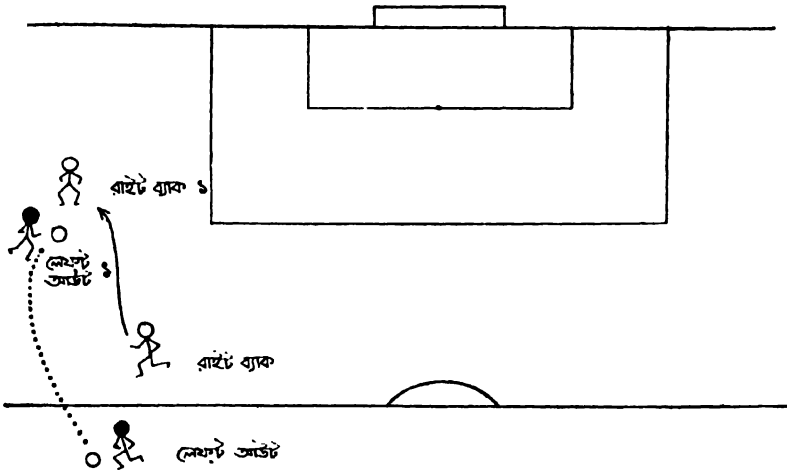
তিন নম্বর ছবি

মধ্যমাঠে বিপক্ষের লেফট আউটের পায়ে বল এবং সে চেষ্টা করছে রাইট ব্যাককে কাটিয়ে গোলের দিকে এগোতে। রাইট ব্যাক কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে বিপক্ষের লেফট আউটকে টাচ লাইনের দিকে নিয়ে গেছে (লেফট আউট ১ এবং রাইট ব্যাক ১); রাইট ব্যাকের এখন লেফট আউটের কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়ার বিশেষ সুবিধা এই জন্যে যে একদিকে টাচ লাইন থাকায় লেফট আউট বল নিয়ে যেতে পারবে না এবং তাকে যেতে হলে একমাত্র পথ হল অন্যদিকে যাওয়া এবং সেইদিকে দাঁড়ানো রাইট ব্যাকের পক্ষে বল কেড়ে নেওয়া এখন আগের তুলনায় অনেক সহজ।
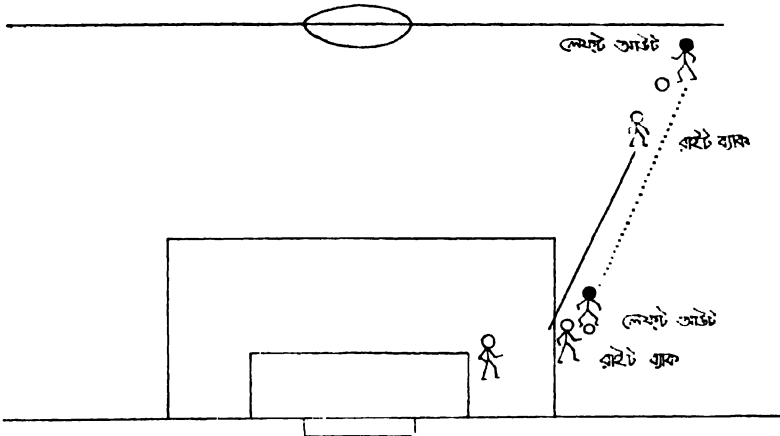
চার নম্বর ছবি

বিপক্ষের লেফট আউটের পা থেকে সিধেসিধি বল কাড়বার চেষ্টা না করে রাইট ব্যাক এখানে তাকে আস্তে আস্তে পিছনের দিকে যেখানে তার আর একটি ডিফেণ্ডার দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে টেনে এনেছে। এর দ্বারা সংখ্যাধিক্য হওয়ায় সুবিধা পাওয়া যায়। অর্থাৎ একজনের বিরুদ্ধে দুজন। সাধারণত বিপক্ষের ফরোয়ার্ড যদি খুব চতুর এবং তীব্র গতিসম্পন্ন হয় তাহলে উইং ব্যাকের একা একা ট্যাক্‌ল করতে না গিয়ে এই ধরনের পিছিয়ে এসে একজনের বিরুদ্ধে দুজনের ট্যাক্‌ল করার চেষ্টা করাই উচিত।

ফুটবল খেলার এগারোটা পজিসনের ভেতর এই স্টপার পজিসনে শরীরের সঙ্গে মনের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী কতগুলো গুণের সমাবেশ প্রয়োজন। যেমন স্টপারের উচ্চতা হবে ছ ফুটের কাছাকাছি, শরীর এবং পেশীগুলো বিপক্ষের অথবা নিজের খেলোয়াড়েরও ধাক্কা সামলাবার জন্য হওয়া চাই খুবই বলিষ্ঠ। সেই সঙ্গে চাই শরীরের চটপটে ভাব, তীব্রগতি ও যথেষ্ট উঁচুতে লাফানোর ক্ষমতা। কেননা দেখা গেছে এই পজিসনে পায়ের চেয়ে লাফিয়ে হেড করে বল বার করে দেবার প্রয়োজনই হয় সবচেয়ে বেশী। সাধারণত এই গুণগুলো যাদের শরীরে থাকে তারা ছটফটে স্বভাবেরই হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা এ ক্ষেত্রে তার থেকে বিশেষ করে চাই ধীর ও স্থিতপ্রজ্ঞ ভাব। মনের দিক থেকে তার যদি এই বিশেষ গুণ না থাকে, খেলা চলাকালীন তার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতায় এতটুকু যদি ত্রুটি ঘটে, তাহলে তার গোল খাবার সম্ভাবনা থেকে যায়।
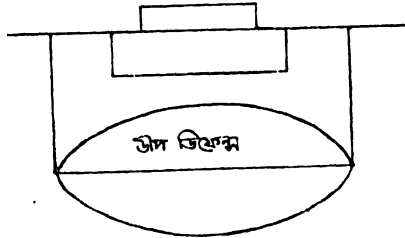
এক নম্বর ছবি

এক নম্বর ছবিতে 'ডীপ-ডিফেন্সের' স্থলটি দাগ দিয়ে দেখানো হচ্ছে। যে কোনো টিমের পক্ষে এই অঞ্চলটি যদি ডিফেন্সশূন্য থাকে তাহলে সত্যই ভয়াবহ। কেননা যা কিছু গোল তা বিশেষ করে এই জায়গা থেকেই হয়। তাই দুজন স্টপারের ভিতর একজনের অন্ততঃ কোন কারণেই এ অঞ্চল থেকে সরে গেলে চলবে না, এবং এই জায়গাটুকু থেকে প্রতিপক্ষের কাকেও গোলে শট বা হেড করতে দেওয়া হবে না।
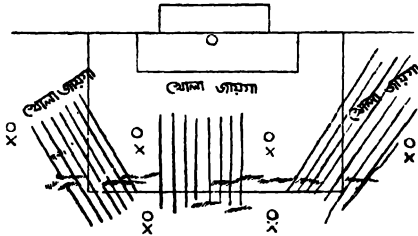
দুই নম্বর ছবি

চার ব্যাক প্রথায় দুটি স্টপার বিপক্ষের দুজন ফরোয়ার্ডকে গার্ড করে কেমনভাবে দাঁড়াবে তারই ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ডিফেন্সের ঐ বিরাট অঞ্চলটা তিনজন মাত্র ব্যাকে কভার করছিল বলে বিপক্ষের ফরোয়ার্ডরা বেশ কিছুটা গোল করবার বা ফাঁকা জায়গা তৈরী করবার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছিল। কিন্তু তিনজন ব্যাকের পরিবর্তে চার ব্যাক প্রথা চালু হওয়ায় শুধু যে 'ডীপ ডিফেন্সটাই' ঘন সন্নিবন্ধ হয়ে উঠল তাই নয়, সাইড ব্যাকের ফাঁক তৎক্ষণাৎ পূরণ করবারও বিশেষ সুবিধা হল।

উইং হাফ

আয়ার্ল্যাণ্ডের উইং হাফ ড্যানী ব্ল্যাঞ্চ ফ্লাওয়ার তার আত্মজীবনীতে লিখছেন, "ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমার এখনকার ক্রীড়া ক্ষমতার উপর 'জন্মগত প্রতিভা বা দক্ষতা' এই লেবেলটি এ'টে দিও না। দয়া করে মনে রেখ আজকের এই যে আমি, যাকে বলা হয় সম্পূর্ণ ফুটবলার, সে তার সব গুণই অর্জন করেছে ম্যাচ খেলতে খেলতেই, অন্য কিছু থেকে নয়।"

উঠতি উইং হাফদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন, "প্রখ্যাত পেশাদারী উইং হাফদের সব কিছু সব সময় নকল করা তোমার কাছে কল্যাণকর নাও হতে পারে। কেননা এই সব নামকরা খেলোয়াড়েরা অনেক কিছুই করে যা এখনই করা তোমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই প্রথমে জেনে নাও ভাল করে উইং হাফের মূল করণীয় কি। স্ট্যামিনা তৈরীর পর তার কাজ হল প্রথমেই ডিফেন্স সামলানো আর তার পরেই আসবে নিজের আক্রমণ তৈরীতে চেষ্টা করা: অর্থাৎ দ্রুত এবং সঠিক জায়গায় বলটি জোগান দেওয়া। সারা মধ্যমাঠে তাকে বিপক্ষের ফরোয়ার্ডরা হয়রান করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এতে তাকে এক মুহূর্তের জন্য মেজাজ হারালে চলবে না। শান্তচিত্তে বিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের সম্মিলিত মুভটিকে হয় ভেঙে দিতে হবে, না হয় যেই তারা গোলে কিক্ করতে যাবে অমনি তাকে সেই প্রচেষ্টায় সাধ্যমত বাধা দিতে হবে।" আক্রমণে সহায়তা করবার জন্য উইং হাফকে কতখানি সজাগ হতে হবে সেই প্রসঙ্গে সব শেষে তিনি লিখছেন, "এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও তুমি হয়ত একটা ভাল হাফব্যাক নাও হতে পার, যদি না তোমার যথেষ্ট কল্পনাশক্তি থাকে। যেমন ধরা যাক, তুমি রাইট হাফ খেলছ—তোমার পায়ে বল। তোমার সামনেই, তোমারই রাইট ইন ফাঁকায় দাঁড়িয়ে বল চাইছে। তুমি তাড়াহুড়ো করে সেই বলটি ঠেলে দিলে মাত্র ৫ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার রাইট ইনকে। ঠিক সেই সময়েই, তুমি চোখ তুলে একবারের জন্যও দেখলে না যে, তোমারই লেফট আউট লাইন ঘেঁষে একেবারে ফাঁকায় ৩০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে, এবং রাইট ইনের পরিবর্তে বলটি তাকে ঠেললে গোল ছিল অবধারিত। এই যে পর্যবেক্ষণ শক্তির অভাব, এটাই তোমাকে হাফব্যাক হিসেবে উঁচুতে উঠতে দেবে না। সর্বদা মনে রাখবে—তুমিই টিমের প্রধান সেনাপতি, ব্যাকরুম প্ল্যানার। তুমিই একই সঙ্গে বুদ্ধি ও পেশী। টীমের অন্য সবাইকার চেয়েও ফুটবল সর্বদাই তোমার কাছ থেকে উইং হাফ হিসেবে একটু বেশী কর্মদক্ষতা কামনা করবে।"
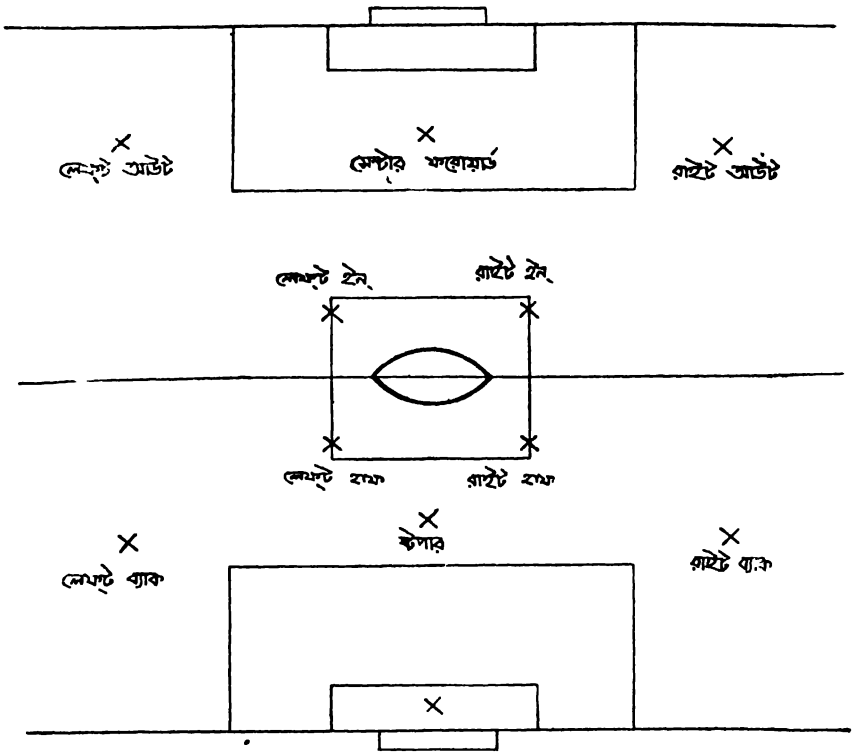
এক নম্বর ছবি

ফুটবল যতদিন 'রোভিং সেণ্টার হাফ' পদ্ধতিতে খেলা হত ততদিন উইং হাফের কর্তব্য ছিল বিপক্ষের উইং ফরোয়ার্ডকে নজর রাখা। কিন্তু থার্ড ব্যাক প্রথা চালু হলে উইং হাফ ব্যাককে ঢুকে পড়তে হল ভিতরে। তার প্রধান কর্তব্য হল বিপক্ষের ইনসাইডকে আটকে রাখা। আগে সারা মাঠ জুড়ে খেলে যে কাজটি রোভিং সেণ্টার হাফকে করতে হত, এ প্রথায় সেই কাজটিই দু' ভাগ হয়ে দু'জন উইং হাফের উপরই বর্তাল। প্রত্যেক বাড়ি যেমন তার ভিতের উপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক ফুটবল প্রথাতেই কতগুলো পজিসন থাকবেই—যাকে এই ভিতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এক নম্বর ছবিতে দুই হাফ এবং দুই ইনকে জুড়ে এই যে চতুষ্কোণ ঘরটি টানা হয়েছে এইটাই এই প্রথার ভিত। আক্রমণ কিংবা প্রতি-আক্রমণের সময়ে এই চারজন যদি ওঠা-নামা না করতে পারে তা হলে টিমটি সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে না।
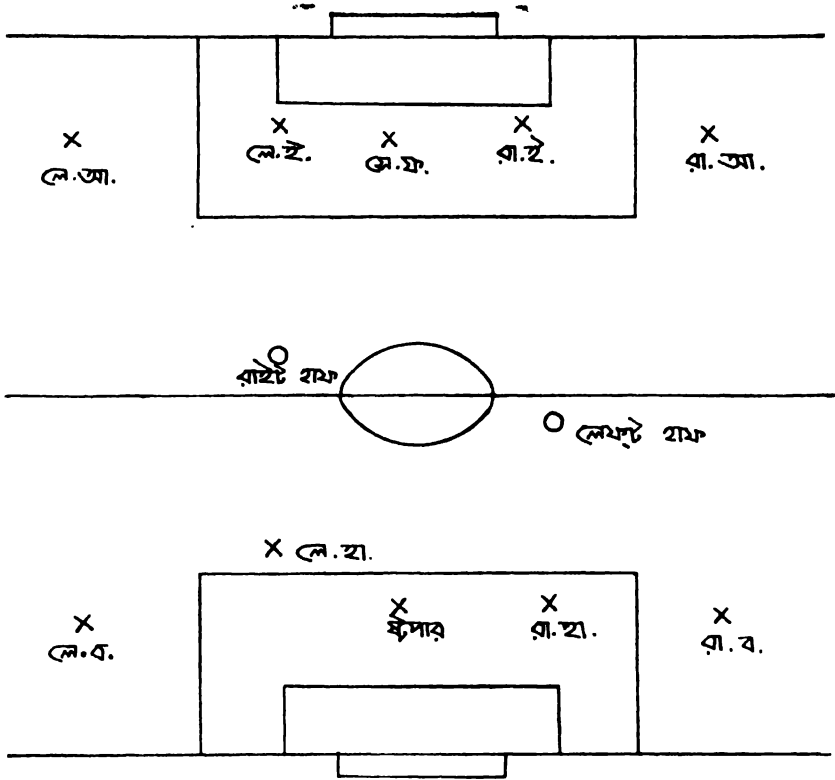
এক নম্বর ছবি

পাঁচ ফরোয়ার্ড পদ্ধতিতে ইনসাইডের খেলাকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রথম ধরনের ইনসাইডরা—ইনসাইডের যে মূল কর্তব্য সামনের তিন ফরোয়ার্ডকে (দুটো আউট ও সেনটার ফরোয়ার্ড) শুধু বল জুগিয়েই কর্তব্য শেষ করতেন না। তাঁরা খেলার সারাক্ষণই যেমন বিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়কে ড্রিবল করে পাশ করতেন নিজের ফরোয়ার্ডকে, তেমনি দলের পতন রোধ করতেও নিজের ব্যাক এরিয়ার ভেতর নেমে এসে ডিফেন্সকে সাহায্য করতেন। এদেরকেই বলা হয় 'স্কিমার'। ফরোয়ার্ড ও ডিফেন্সের খেলো-য়াড়দের ভিতর এরাই ছিলেন সংযোগসেতু। কাজেই কোন টীমে যদি এ ধরনের উপযুক্ত ইনসাইড না থাকত বা কোন কারণে তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজটুকু না করতে পারতেন, তাহলে সে টীমের পক্ষে ভাল খেলা কিছুতেই সম্ভব হত না।

(খ) প্রথম ধরনের মত দ্বিতীয় ধরনের ইনসাইডরাও সামনেব তিন ফরোয়ার্ডকে বল জোগান দিতেন কিন্তু সংগে সংগে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে গোলে সুতীব্র শট নিতেও দ্বিধা করতেন না। এই ধরনের ইনসাইডকেই বলা হয় 'স্ট্রাইকার'। গোল করতে গিয়ে অনেক সময় এ ধরনের ইনসাইডদের সারা মাঠ ছুটে খেলা সম্ভব হত না বা ব্যাক এরিয়ার ডিফেন্সকেও সাহায্য করা সম্ভব হত না. তবে টীমে দুটো ইনসাইডের ভেতর একজন স্ট্রাইকার ও অন্যজন স্কিমার হিসেবে খেলাই ছিল পাঁচ ফরোয়ার্ড সিস্টেমের আদর্শ রূপ।

এখানে এই এক নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে যে, আক্রমণের সময় পাঁচটি ফরোয়ার্ডই বিপক্ষের গোল এরিয়ার ভেতর ঢুকে পড়েছে। কিন্তু আক্রমণ সফল না হওয়াতে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা

প্রতি-আক্রমণ করাতে ক্রশ দেওয়া ডিফেণ্ডাররা গোল বাঁচাতে নিজের ব্যাক এরিয়ার ওপর চলে এসেছে। এই মুহূর্তে দুই আউট বা সেনটার ফরোয়ার্ড ত্বরিত গতিতে না ফিরলেও টিমের বিশেষ ক্ষতি হবে না। কিন্তু ইনসাইড দুজনকেই বিপক্ষের দুই হাফকে (গোল্লা মার্কা) কভার করে নেমে আসতে হবে, যাতে ঐ দুজন হাফ অন্তত পিছন থেকে আক্রমণ রচনায় বা গোলে শট নেওয়ার চেষ্টা না করতে পারে। এই মধ্য মাঠে ফিরে আসতে পারলে ইনসাইডদের সঙ্গে সঙ্গে তার ডিফেণ্ডারদের আর একটি সুবিধা হবে এই যে, যদি তারা বল কেড়ে নিতে পারে, তাহলে ইনসাইডরা কাছে থাকাতে তৎক্ষণাৎ তারা তাদেরকে বল জুগিয়ে দ্রুত আক্রমণকে সুষ্ঠু এবং ধারালো রূপ দিতে পারে।

দুই নম্বর ছবি

আজ থেকে বছর পনেরো আগেও ফুটবলারদের ধারণা ছিল যে, ফুটবল ছাড়া ফুটবল খেলায় কোন রকমের সাফল্য লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণাকে প্রথম ভুল প্রমাণ করলেন ইংল্যাণ্ডের ইনসাইড হেইন্স। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বিপক্ষের ডিফেণ্ডারকে সরিয়ে নিজের ফরোয়ার্ডদের বল নিয়ে যেতে কিংবা কিক্ মারার সুযোগ করে দিতে তিনি বল ছাড়াই এদিক ওদিক ছুটে এমনই নিত্য-নতুন মুভ্ সৃষ্টি করতে লাগলেন যে, তার নামেই এ ধরনের খেলাকে বলা হতে থাকল হেইন্স-স্টাইল। এই ছবিতে তারই একটি নমুনা দেখানো হচ্ছে। স্ট্রাইকারের পায়ে বল, কিন্তু তাকে গোলে কিক্ না করতে দেবার মানসে কোণাকুণিভাবে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের দুজন স্টপার। এ অবস্থায় স্ট্রাইকার যাতে গোলে শট নিতে পারে, সেই জন্য স্ট্রাইকারের পিছন দিয়ে স্কিমার বিন্দু বিন্দু লাইন ধরে স্কিমার ১-এর পজিসনে ছুটল। বল পেলে স্কিমার গোল করে দিতে পারে, সেই আশঙ্কায় পেছনের স্টপারটিও বিন্দু বিন্দু লাইন ধরে স্টপার ১-এর পজিসনে চলে আসবে বা ধরে নেওয়া যাক এল। এখন স্ট্রাইকারের সামনে একটি মাত্র স্টপার থাকায় এবং বাঁ দিকটা খোলা থাকায়, অনায়া সেই সে তীর চিহ্নিত লাইন ধরে আরও ভেতরে ঢুকে গোলে শট নিতে পারবে। বিনা বলে স্কিমারের স্রেফ এই দৌড়নটুকুই এখানে গোল করার সুযোগ এনে দিল।

"শালে, শূওর কী বাচ্চে, বেত্মিজ পোস্ট কা অন্দর গেন নেই রাখনে শিক্তা তো ময়দানমে বুট-উট পিন্‌কে কিঁউ উতারতা! আরে গিধ্‌ধর, পয়েলে সিরিফ্ নিশান তো ঠিক রাখ্, তব্ তো দুসরা চিজ্ ইলাজ কর না। হায় খুদা ইয়ে ভি বাহার!" কার উদ্দেশ্যে ঠিক এ ধরনের গালিগালাজ চলছে তা ধরতে না পেরে, আমরা তখন গুটি গুটি পায়ে, পোস্টের একদম পিছন দিকে চলে গিয়েছি। প্র্যাকটিস শেষ হবার পর ছোলা চিবতে চিবতে একজন সিনিয়র ফুটবলার আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল, "রসিদ সাহাব, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?" ভারতের অদ্বিতীয় সেণ্টার ফরোয়ার্ড হাফিজ রসিদ মৃদু হেসে বললেন, "কিঁউ নেহি, বাতাও!" "মানে আপনি তখন বিড়বিড় করে আপন মনে কাকে গালাগাল দিচ্ছিলেন?" রসিদ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "গালি? ম্যায়? নেহি নেহি, কভি নেহি। ম্যায় কিসিকো কভি গালি নেহি ফেকতা।" ওনার এ কথায় কেউ কোন প্রতিবাদ না করে চুপ করেই থাকল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ হা হা করে আপন মনে হেসে উঠে বললেন, "আভি ইয়াদ্ আ গিয়া। ওহি টাইম্‌মে ম্যায় তুমলোক্‌কো কুছ নেহি বোলা। কুছ্ মাৎ শোচ্‌না।" এর পর অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন হাফিজ রসিদ। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে তুলে আমাদের দিকে চেয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, "দেখো, উঁচুদরের সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে সারা ভারতময় নাম করতে আমাকে কম পরিশ্রম করতে হয়েছে! কম ঘাম শরীর থেকে ঝরাতে হয়েছে! আজ যে ধরনের হাফ ভলিটা তোমাদেব শেখাচ্ছিলাম, সেটা আমার খেলোয়াড়ী জীবনে দশটার ভেতর দশটাই নেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু বয়সের ভারে এবং চর্চার অভাবে দশটার ভেতর দুটোও আজ কারেক্ট করতে পারছি না। অথচ নানান ধরনের কিক্ তৈরি করতে সেদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে কিক্ করেছি। এক এক সময় অনুশীলনের পর আমাকে তো চ্যাংদোলা করে টেণ্টে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হত। হেঁটে ফিরি সে ক্ষমতাটুকুও আমার পায়ে থাকত না।" আমাদেরই ভেতর কে একজন প্রশ্ন করল, "অত রকমের কিক্ অনুশীলন করে কি খেলায় বিশেষ উপকার পাওয়া যেত?"

এবার ফিক্ করে হেসে রসিদ বললেন, "এটা তো উপকারের কথা নয়—প্রয়োজনের কথা। তুমি যদি এক পায়ের গোল-গেটার হও, তা হলে প্রথম বছর হয়তো কিছু গোল তুমি করতে পারবে, কিন্তু পরের বছরই দেখবে তোমার গোলের সংখ্যা ক্রমশ শূন্যের কোঠায় নেমে আসছে। কেননা, বিপক্ষের ঝানু ডিফেণ্ডাররাও চুপচাপ বসে নেই। তারাও তোমার গলদটুকু বার করে তোমার গোল করার বারোটা বাজিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। তাই সর্বদা মনে রাখবে, গোল করনেওয়ালা ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে গোল করতে না দেওয়া ডিফেণ্ডারদের অবিরাম যুদ্ধ চলছে। আর এই যুদ্ধে তুমি যদি ফরোয়ার্ড হিসেবে নিত্য-নতুন অস্ত্র না তৈরি করতে পার, তাহলে তোমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর আমাদের সময় গোল করা তো আজকের তুলনায় আরও অনেক শক্ত ছিল। ইয়া ইয়া হোঁৎকা বিলিতী মিলিটারী সাহেবগুলো তো আমাকে বল ধরতে দেবার আগেই আমার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য রেডি হয়ে থাকত। ট্যাকলিং-এর সময় তাদের পা বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতাও ছিল অস্বাভাবিক। আর তাদের মাথার ওপর দিয়ে হেড নেওয়াটাও ছিল আরও দুরূহ।"

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, "তা হলে আপনি এত গোল করতেন কি করে?"

"খেলার সারাক্ষণ আমি শিকারী বেড়ালের মত ছুঁকছুঁক করে ঘুরতাম কখন বিপক্ষের ফুল ব্যাক একটু ঢিলে দেয়, গ্যাপ ফেলে কিংবা বল গোলকীপারের হাত ছিটকে বেরিয়ে আসে—আর সে সুযোগ থেকেই তো আমি কত যে গোল করেছি! এ ছাড়া নানান দেশী-বিদেশী টিমের বিরুদ্ধে খেলে এই অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছিল যে, কোন বড় টিমের ঝানু ডিফেন্ডাররাই সারা খেলায় তিন-চারটের বেশী নির্বিঘ্নে গোলে শট্ নেবার সুযোগ আমায় দেবে না। এবং ঐ সীমায়িত সুযোগ থেকেই আসবে আমার সাফল্য, আমার টীমের জয়। তাই দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি টার্গেট প্র্যাকটিস করেছি।"

সবাই একই সঙ্গে প্রশ্ন করেছি, "টার্গেট প্র্যাকটিসটা কি জিনিস?"

রসিদঃ "সার্কাসে দেখেছ নিশ্চয় যে, খেলোয়াড়ের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, আর সে সেই অবস্থায় ছুরি কোনও মেয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীর বাঁচিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে দিচ্ছে। আমারটা অবশ্য চোখ বাঁধা ছিল না। পোস্টের লাইনের ওপর বাক্স কিংবা কাঠি সাজিয়ে রাখতাম, আর বলে বলে সেই স্পটে মারবার অনুশীলন করতাম। শুধু যে মাটিঘেঁষা বলে তাই নয়, মাটিতে, শূন্যে কিংবা মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঐ টার্গেটে মারা অনুশীলন করতাম। এর ফলে আমার শুটিং অ্যাকিউরেসি এত পারফেক্ট হয়েছিল যে দুটি সুযোগে একটি গোল আমি করতামই।"

আমিঃ "আপনি তবে গালাগাল দিচ্ছিলেন কেন?"

রসিদঃ "ব্যাপারটা কি জান, সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে নিজের ক্ষণিক ঢিলেমিকে কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই। সর্বদা তাকে গালিগালাজের চাবুক দিয়ে এমন চাঙ্গা রাখতে হবে যে, সে সেতারের টান টান তারের মত ঝন্ঝনিয়ে উঠবে।"

অবশেষে হাফিজ রসিদ বলেছিলেন, "ইয়াদ রাখ্না বেটা, সারে খেলমে সিরিফ একঠোই চীজ্ হ্যায়—গোল বানানা। ঔর উসিকো লিয়েই এত্না হুজ্জত্—এত্না দিকদারি।"

এই প্রসঙ্গেই স্কটল্যাণ্ডের আর এক ফরোয়ার্ড ডেনিস ল লিখছেন, "ফুটবল মানেই হল—গোল। এবং কেউই দুর্বল শুটিং পছন্দ করে না। এ বিষয়ে আমার মূল বক্তব্য হল যে পৃথিবীর সব ফুটবল-দর্শকই সবকিছু এবং সবাইকেই ক্ষমা করতে রাজী আছে, শুধু গোলের সামনে অবিরত বাইরে মারা ফরোয়ার্ডকে ছাড়া।" এর পরেই আগামী দিনের সেণ্টার ফরোয়ার্ডদের উদ্দেশ্য করে তিনি লিখছেন, "আজকের ফুটবল-জগতে এমন এমন প্রখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ডও আছে, যারা ক্বচিৎ কখনও নিজেরা গোল করে। তারা অপর ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে মিশে থাকে এবং সেখান থেকেই নানান ধরনের সুন্দর সুন্দর পাস দিয়ে নিজের ফরোয়ার্ডদের অথবা হাফ ব্যাকদের গোল করতে সাহায্য করে। কিন্তু আমার মূল আলোচনা হচ্ছে, কে কাকে বল যোগাল তাই নিয়ে নয়, বরঞ্চ সেই ফরোয়ার্ডই যে সেণ্টার ফরোয়ার্ডের জায়গায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষের গোলে বল ঢুকিয়ে দিল। আজকের ফুটবলে যাকে বলা হয় 'স্ট্রাইকার'। প্রথমেই সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে যেমন তার দৌড়নোর সময় সম্পর্কে তীব্র সজাগ থাকতে হবে, তেমনি তার সহ-খেলোয়াড়দেরও। গোল করবার আশায় এবং তোমার সহ-খেলোয়াড়দের বল ছাড়বার অনেক আগেই তুমি বিপক্ষের গোল এরিয়ার দিকে ছুটে দেখ যে, রেফারী অফ-

সাইডের বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। আবার অফসাইড বাঁচাবার মানসে একটু দেরি করে ছোটো—দেখবে বিপক্ষের কোন-না-কোন ডিফেণ্ডার সেই ফাঁকা জায়গাটুকু কভার করে নিয়েছে। কাজেই তোমার অপর ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে অনুশীলনের সময় এমন বোঝাপড়া করবে, যা ম্যাচে তোমার গোল করায় সফলতা আনবে। এর পরে আসবে শুটিং। স্ট্রাইকার হিসেবে নাম করতে হলে আলাদা করে তোমায় খাটতে হবে——এবং এ বিষয়ে তোমার অনেক সহজ সুযোগও রয়েছে। এ ব্যাপারে একটি ফাঁকা দেওয়ালই আদর্শ। একটা খড়ি দিয়ে পোস্টের চার ভাগের এক ভাগ মাপের আয়তনের গুটি কয় গোলপোস্ট এঁকে এবং বলকে না ট্র্যাপ করে দু পা দিয়ে মাটিতে অথবা শূন্যে বল যখন যেমন ভাবে ফেরত আসবে সেই অবস্থাতেই ঐ দাগে মেরে যাও। আর যদি বল খুব উঁচুতে ফেরে, যেখানে পা দিয়ে মারা সম্ভব নয়, তা হলে হেড করে দাগে মার। এইরকম মারতে মারতে তোমার আত্মবিশ্বাস এমনই বাড়বে যে, পোস্ট ছেড়ে, 'অ্যাঙ্গল শর্ট' করে বেরিয়ে আসা গোলকীপারকেও তুমি পরাস্ত করতে অসুবিধা ভোগ করবে না। এই বিষয়ে সর্বদা মনে রাখবে যে, মাটি ঘেঁষা কিংবা হাত খানেকের মত উপর দিয়ে যাওয়া বল উঁচু বলের তুলনায় বাঁচান গোলকীপারের পক্ষে অনেক বেশী শক্ত। কেননা, শূন্যে লাফানর চেয়ে 'ড্রাইভ' দিতে গোলকীপারের অনেক বেশী সময় লাগে।"

উইঙ্গার

তীব্রগতিতে বল নিয়ে কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছে পেঁছিয়ে, উঁচু করে বিপক্ষের পেনাল্টিবক্সের অথবা ব্যাক এরিয়ার ভিতর নিখুঁত সেণ্টার করেই এক সময় উইঙ্গারের কর্তব্য ফুরিয়ে যেত। সারা খেলায় আক্রমণে এইটুকু ভূমিকা ছাড়া দলের অপর খেলোয়াড়রা সেদিন উইঙ্গারের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করত না, বা আশা করার কথা চিন্তাও করত না। গত বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর দু একজন উইঙ্গার যখন ড্রিবল করে (সর্বদাই কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে না গিয়ে) বিপক্ষের গোল পোস্টের দিকে গিয়ে, গোলে শট্ নিতে সুরু করল, এবং তাদের এ প্রচেষ্টাতে গোলও হতে থাকল—তখন থেকেই উইঙ্গারের খেলাটা নতুন সম্ভাবনার দিকে মোড় নিল। এর কিছু পরে হাঙ্গারী প্রবর্তিত 'উইথড্রল-সেন্টার ফরোয়ার্ড' প্রথায় উইঙ্গারকে বলা হোল শুধু আক্রমণ করেই তার কর্তব্য শেষ করলে চলবে না, প্রয়োজনে তাকে কিছুটা প্রতিরক্ষার কাজও করতে হবে। বিশেষ করে তার দিকের বিপক্ষের উইঙ্গারকে মধ্যমাঠ পর্যন্ত নজর রাখতে হবে, যাতে সেই ফরোয়ার্ডটি বিনা বাধায় তার গোলকীপার অথবা ব্যাকের কাছ থেকে বল নিয়ে অনায়াস-আক্রমণ রচনার সুযোগ না পায়। এবং প্রতিরক্ষার এই চেষ্টা-টুকুতে সে যদি বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে না নিতেও পারে, তবু তার পিছন থেকে তাড়া করার ফলে—তার উইং ব্যাকের পক্ষে বিপক্ষের পা থেকে বল ট্যাক্‌ল করা অনেক সহজ হয়। এই প্রতিরক্ষার কাজের সঙ্গে সঙ্গে উইঙ্গারকে নিজের ব্যাক-এরিয়ায় নেমে এসে নিজের গোলকীপারের অথবা ডিফেণ্ডারের কাছ থেকে বল নিয়ে আক্রমণ রচনার সূত্রপাতও করতে বলা হোল।

এরপর ৪-২-৪ প্রথায় এসে উইঙ্গারের কাজ আরও ব্যাপক হল। প্রথমতঃ এ প্রথায় পাঁচজন ফরোয়ার্ডের জায়গায় চারজনের উপর সব ভার এসে পড়ায়—

প্রত্যেক ফরোয়ার্ডকেই আগের তুলনায় অনেক বেশী জায়গা জুড়ে খেলতে হবে এবং যার ফলে আজকের উইংগারের স্ট্যামিনার প্রয়োজন যেমন আগের তুলনায় অনেক বেশী লাগছে, তেমনি উইংগারকে জায়গা বদল করে অন্য ফরোয়ার্ড পোজিশনেও প্রায়ই খেলতে হচ্ছে বলে, আজকের উইংগারকে শুধু মাত্র নিজের পোজিশনের খেলাটুকুতে দক্ষ হলেই চলবে না—তাকে অন্যান্য ফরোয়ার্ড-পোজিশনের আঙ্গিকগত কৌশলেতেও বিশেষ রপ্ত হতে হবে। না হলে উইংগার হিসেবে সাফল্য লাভ তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

এত পরিবর্তন সত্ত্বেও কিন্তু উইং পোজিশনের খেলার মূল সমস্যাটা আগে যা ছিল আজও তাই। অন্যান্য ফরোয়ার্ডদের তুলনায় আজও তাকে সবচেয়ে বেশী বিপক্ষের আঁটোসাঁটো নজরের ভিতর খেলতে হয়। অন্য ফরোয়ার্ডরা নিজেদের ফাঁকা জায়গা তৈরী করতে মধ্যমাঠের বিস্তৃত পরিসরের সুযোগটুকু পেয়ে থাকে, কিন্তু উইংগারের ক্ষেত্রে একদিকে টাচ্ লাইন থাকায়—সে সম্ভাবনা-টুকুও বিলুপ্ত। সেই সঙ্গে ছায়ার মত বিপক্ষের ব্যাক তার সঙ্গে লেগে থাকবে। তাই সার্থক উইংগার হতে হলে—তাকে বল নিয়ে এবং বল ছাড়া তীব্রগতিবেগ-সম্পন্ন হতেই হবে। এবং এই তীব্র গতিবেগের উপরেই প্রয়োজন মত বল সমেত-একেবারে থামিয়ে দেওয়া ও থামানো অবস্থা থেকে চকিতে বল নিয়ে তীব্রবেগে দৌড়নোর অনুশীলন করতে হবে। এই সঙ্গে নিখুঁত ড্রিবলিং, দু পায়ে গোলে কিকিং ও মাপা সেনটারিং-এ বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে।

এক নম্বর ছবি

এক নম্বর ছবিতে উইংগারের বল তুলে বিপক্ষের গোল মাউথে সেণ্টারিং-এর ভংগী দেখানো হচ্ছে। এই সময়ে পা বলের কোন জায়গায় লাগবে এবং শরীরের ওপরের অংশ কি অবস্থায় থাকবে সেটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এবং এ বিষয়ে উইংগারকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে নিখুঁত সেণ্টারিং তার কাছ থেকে দলের অন্য ফরোয়ার্ড বা খেলোয়াড়রা সর্বদাই আশা করে। এবং এ সময়ে সর্বদা যে বিনা বাধায় তা সম্ভব হবে তা নয়। যেমন এখানে ডোরাকাটা ইউনিফর্ম পরা ডিফেণ্ডার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও উইংগার সেণ্টার করছে, এবং এই সেনটারিং উইংগারকে স্থির ও চলতি বলে অনুশীলন করতে হবে।
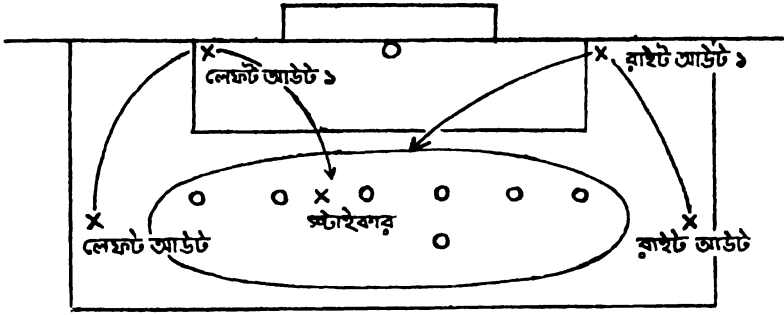
দুই নম্বর ছবি

গোল এরিয়ার উপর স্বপক্ষের এক বা দুই ফরোয়ার্ডকে যখন বিপক্ষের অনেক ডিফেণ্ডাররা ঘিরে থাকে—তখন সেখানে বল পাস করবার চেষ্টা না করে, উইংগারের উচিত এই দুই নম্বর ছবির মত বল বিপক্ষের টাচ্ লাইনে নিয়ে গিয়ে ব্যাক্ সেণ্টার করা। এবং এই বলে গোল করা আক্রমণকারীর ফরোয়ার্ডদের পক্ষে (যদিও তারা সংখ্যায় বিপক্ষের তুলনায় অনেক কম) অনেক সহজ, কেননা বিপক্ষের গোলপোষ্টকে তারা সামনে পাচ্ছে।
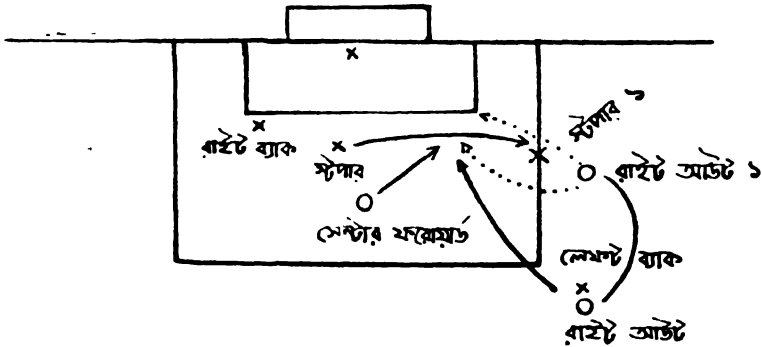
তিন নম্বর ছবি

তিন নম্বর ছবিতে উইংগারের গোল করার একটি প্রচেষ্টা দেখানো হচ্ছে। রাইট আউট বিপক্ষের লেফ্ট ব্যাককে কাটিয়ে তীর চিহ্নিত জায়গা দিয়ে ভিতরে না ঢুকে বিপক্ষের স্টপার ১-এর কাছে গেল। এবং স্টপার ১কে না কাটিয়ে নিজের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে বলটা ঠেলে দিয়েই বিন্দু বিন্দু দেওয়া লাইনের যে কোন একটা ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ড সেই বলকে ট্র্যাপ্ না করে, তীর চিহ্নিত লাইন ধরে বলকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এবং এর ফলে রাইট আউটের সামনে বিপক্ষের গোলকীপার ছাড়া আর কেউ নেই। উইংগারও যে গোল করতে পারে তারই একটি নমুনা এই ছবিতে তুলে ধরা হোল। তবে এ ধরনের পাসে অন্যান্য ফরোয়ার্ডের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ বোঝাপড়া চাই, না হলে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়।

থ্রো-ইন, পেনাল্টি কিক্, কর্ণার কিক্ ও ফ্রি কিক্

থ্রো-ইন

'থ্রো ইন'ও একটা সুযোগ, যেখান থেকে অনায়াসেই গোল হতে পারে। যেমন হতে পারে কর্ণার বা ফ্রি কিক থেকে। ফুটবলের আইন বলছে 'মাঠের মধ্যে বল-নিক্ষেপকারী মাথার ওপর দিয়ে বল মাঠে নিক্ষেপ করবে'। কিন্তু বল মাথার পিছনে নিয়ে যাওয়ার আগে ফুটবলারকে দুহাত দিয়ে এমন ভাবে তাকে ধরতে হবে যাতে সে বল নিক্ষেপের সময় জোর দিতে পারে ও সেই সময় কোন হাতের জোর যেন কম-বেশী না হয়, তাহলে রেফারী 'ফাউল থ্রো'র নির্দেশ দেবে।

এক নম্বর ছবি

এক নম্বর ছবিতে 'ফাউল থ্রো'-এর নিদর্শন দেখানো হচ্ছে। ডান হাত বলে পুরোপুরি ছুঁয়ে আছে, কিন্তু অন্য হাতের অল্প অংশ ছোঁয়ান থাকায়, এ অবস্থায় বলকে ছুঁড়লেই, ফাউল-থ্রো হবে।
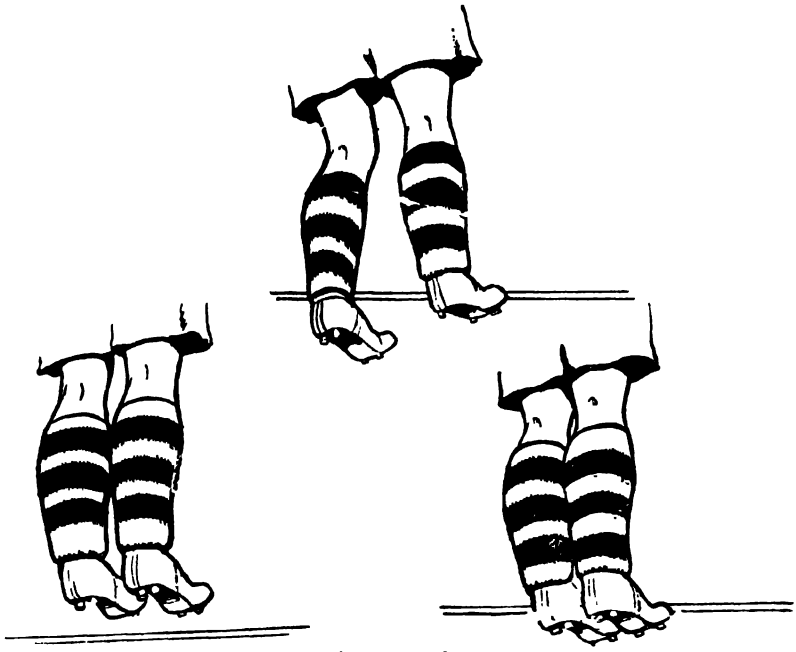
দুই নম্বর ছবি

দু নম্বরে 'থ্রো ইনের' সময় ফুটবলারের দুই পায়ের অবস্থানের ছবি দ্বারা দেখানো হচ্ছে কোনটা ফাউল-থ্রো হবে না এবং কোনটা ফাউল থ্রো হবে। পা জোড়া অথবা পা ফাঁক করা অবস্থায় থ্রো করলেই তা ফাউল থ্রো হবে না। শুধু পা দুটো লাইনের ওপর অথবা মাঠের একটু বাইরে থাকলেই হল। কিন্তু পা দুটো যদি লাইন অতিক্রম করে মাঠের ভেতব থাকে, তাহলে তা 'ফাউল থ্রো'।

তিন নম্বর ছবি

তিন নম্বর ছবিতে 'থ্রো ইনের' পুরোপুরি কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের থ্রোতে মাঠের তিনটে দিককেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন মত তিনদিকে নিজেদের ফুটবলারকে বলও জোগান যায়।

চার নম্বর ছবি

চার নম্বর ছবিতে দূর থেকে ছুটে 'থ্রো ইনে'র কায়দা দেখানো হচ্ছে। এ ধরনের 'থ্রো'তে মাঠের সর্বদিকে বল দেওয়া যায় না, তবে অনেক দূর পর্যন্ত বলকে পাঠান সম্ভব। এই 'থ্রো ইনে'র সময় হাতের ল্যাটিসেরই শক্তি ফুটবলারকে প্রয়োগ করতে হবে, সেই সঙ্গে কোমর থেকেও অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।
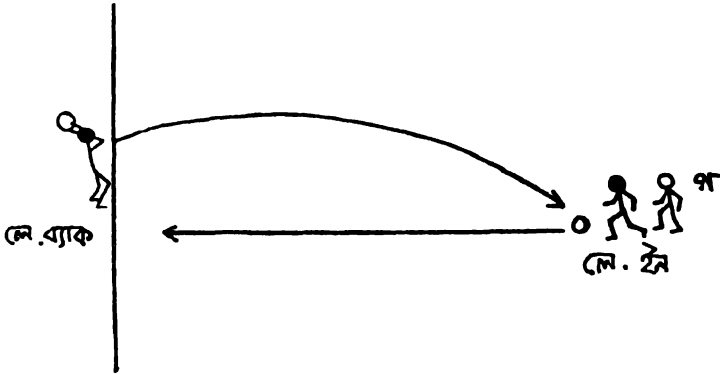
পাঁচ নম্বর ছবি

পাঁচ নম্বর ছবিতে 'থ্রো ইন' থেকে আক্রমণ রচনার একটি সহজ সমবেত প্রচেষ্টা দেখানো হচ্ছে। লেফ্‌ট ব্যাকের দেওয়া বলকে ট্র্যাপ করলেই সেই বল বিপক্ষের গ-এর কেড়ে নেবার সম্ভাবনা থাকায়, লেফ্‌ট ইন (লেফ্‌ট ব্যাক ফাঁকা থাকায়) লেফ্‌ট ব্যাককে বল পাস করছে।

'থ্রো ইনে' শুধু যে নিক্ষেপকারীর বল নিক্ষেপের উপরই সাফল্য নির্ভর করছে, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দলীয় খেলোয়াড়রা সেই বল নেবার জন্য যদি ফাঁক না সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে থ্রো নিষ্ফল হতে বাধ্য। কেননা এই সময়ে প্রত্যেক ফুটবলারের গায়ে গায়ে লেগে থাকবে বিপক্ষের একজন খেলোয়াড় এবং তারা সেই বল ছিনিয়ে নিতে ভুল করবে না। তাই এ ক্ষেত্রে ফুটবলারকে ফাঁকা জায়গায় ছুটতে হবে বল নেবার আশায়, এবং যে মুহূর্তে সে দৌড়বে বিপক্ষের খেলোয়াড়টিও তাকে অনুসরণ করবে। এখন এই ফেলে যাওয়া উন্মুক্ত জায়গায় বল ফেললে, স্বপক্ষের অন্য খেলোয়াড়কে এই বল নিতে অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। কাজেই থ্রো ইনের সময় স্বপক্ষের খেলোয়াড়দের দাঁড়িয়ে বল নেবার চেষ্টা না করে, উন্মুক্ত জায়গায় দৌড়নই ফুটবলারের মূল কর্তব্য।
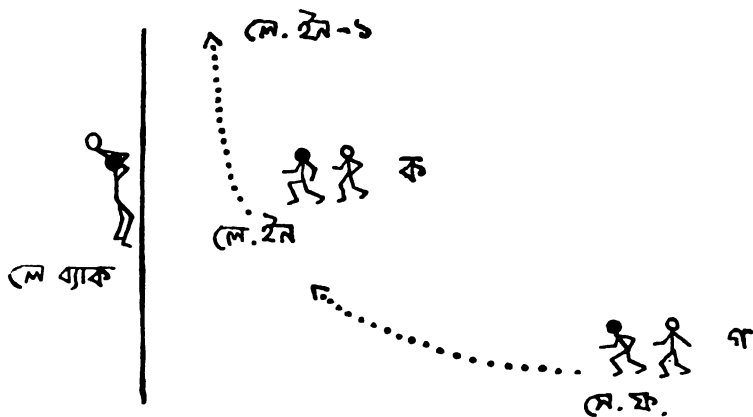
ছয় নম্বর ছবি

ছয় নম্বব ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিপক্ষের ক আঁটভাবে লে-ইনের সঙ্গে লেগে থাকায়, লেফ্‌ট ইন বিন্দু বিন্দু লাইন ধরে লে-ইন—১-এর জায়গায় দৌড়চ্ছে এই আশায় যে বিপক্ষের ক-ও তার সঙ্গে দৌড়বে। এখন উভয়ের ফেলে যাওয়া ঐ ফাঁকটুকুর সুযোগ নেবার জন্য সেন্‌টার ফরোয়ার্ড বিন্দু বিন্দু লাইন ধরে ঐদিকে দৌড়চ্ছে। লেফট ব্যাকের পক্ষে এখন অতি সহজ কাজ হবে ঐ ফাঁকা জায়গায় বলকে থ্রো করা।

পেনাল্টি কিক্

খেলার সময় ফুটবলার যখন পেনাল্টি কিক্ করেন পোষ্টের বাইরে অথবা গোলকীপারের হাতে, তখন সব দর্শকরাই সেই ফুটবলারের অল্প দূর থেকে গোলকীপারকে পরাস্ত করার এই সহজ কাজটুকুর (তাও আবার কিক্ করবার আগে পর্যন্ত গোলকীপার পদক্ষেপ করতে পারবে না) অপারগতায় ক্ষুব্ধ হন। বেশীর ভাগ দর্শকরা তো ভেবেই পান না কেমন করে এ সম্ভব! পেনাল্টি কিক্ অনুশীলনের সময়তেও দেখা গেছে—প্রায় সব ফুটবলারই বিভিন্ন ধরনের কিকিং-এ গোলকীপারকে সহজেই পরাস্ত করে থাকেন, কিন্তু খেলার প্রয়োজনীয় মুহূর্তে

এইসব ফুটবলারদের অনেকের কাছেই এই সহজ কাজটিই এত ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়ায় যে তারা পেনাল্টি কিক্ মারতেই চান না।

আসলে পেনাল্টি কিকের কোন নির্দিষ্ট কায়দা নেই, যার দ্বারা সব সময় গোল করা সম্ভব। কেননা কায়দা অনেক রকম থাকতে পারে কিন্তু এই পেনাল্টি কিকের সমস্যাটা মূলতঃ নার্ভের। তাই দলের এগারোজনই এই কিকে কিছুতেই পারদর্শী হতে পারে না। প্রথমেই খুঁজে বার করতে হবে, দলের মধ্যে কার নার্ভ সবচেয়ে শক্ত। যে কোন পরিস্থিতিতে কে ঘাবড়ায় না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিকিং-এ পারদর্শিতা যুক্ত হলে, তবেই সেই খেলোয়াড়কে পেনাল্টি কিক্ করতে দেওয়া উচিত। কি ধরনের কিক্ সে করবে তার নির্দেশনা না দিয়ে, তাকে স্বাধীনভাবে, তার যে ধরনের কিকে আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি আছে, সেই অনুযায়ী পেনাল্টি কিক্ করতে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়। তবে এ বিষয়ে দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দেরও দায়িত্ব আছে। কেননা পেনাল্টি কিকের পর বল গোলকীপারের শরীরে, হাতে, কিংবা পোষ্টে গেলে ফিরে এলে, দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা তৎক্ষণাৎ সেই বল গোলে মারতে পারে। কাজেই পেনাল্টি কিক্ নেবার সময় দলের অন্যান্য ফুটবলারদের এই সুযোগটুকু নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অন্যান্য কিক্ বা হেডিং-এর মত পেনাল্টি কিকিং-এ পারদর্শী হতে হলে ফুটবলারকে নানান ধরনের কিকিং নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। বল পেনাল্টি দাগে বসিয়ে এবং গোলকীপারকে পোষ্টের ঠিক মাঝখানে দাঁড় করিয়ে, প্রথমে ডান পায়ে ও পরে বাঁ পায়ে দুই পোষ্টের দুই উঁচু ও দুই নীচু কোণে কিক্ করায় পারদর্শী হতে হবে। ফুটবলার যদি কোন একটি মাত্র কায়দায় পারদর্শী হয়, তাহলে বিপক্ষের অভিজ্ঞ গোলকীপার সেই কায়দা আগে থাকতে অনুমান করে পেনাল্টি কিক্ বাঁচিয়েও দিতে পারে। তাই এতে বৈচিত্র্যের বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ফুটবলারকে স্মরণ রাখতে হবে, যেন এই কিকের আগে তার মনের দোনামনা ভাবকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় না দেয়। অর্থাৎ যে ধরনের কিক্ নেবে বলে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতেই যেন সে শেষ পর্যন্ত স্থির ও অবিচল থাকে। কেননা দেখা গেছে এই দোনামনা ভাবের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে পেনাল্টি কিক্ বিপথগামী হয়েছে।

গোলকীপারের পক্ষে পেনাল্টি কিক্ কি বাঁচানো সম্ভব? অবশ্য বিপক্ষ যদি গোলকীপারের হাতে অথবা নাগালের ভিতর বল কিক্ করে তাহলে এ প্রশ্নটাই ওঠে না। এক গোলপোষ্ট থেকে অন্য গোলপোষ্টের দূরত্ব চব্বিশ ফুট। গোলকীপার ঠিক মাঝখানে দাঁড়ালে ফাঁকা জায়গা থাকবে ডানদিকের গোলপোষ্টে বারো ফুট ও বাঁ দিকের পোষ্টে বারো ফুট। মাত্র দশ গজ দূর থেকে (পেনাল্টি-দাগ থেকে গোলপোষ্টের দূরত্ব) কোন একটা পোষ্ট ঘেঁষে, নীচু অথবা উঁচু দিয়ে, বল যখন সুতীব্রগতিতে গোল অভিমুখে যায়, তখন পদক্ষেপের সুযোগ না নিয়ে, কোন মানুষের শারীরিক সাধ্যের পক্ষে কি সম্ভব সেই বল বাঁচানো? নিঃসন্দেহে বারো ফুটের এই ব্যবধানকে শারীরিক সক্ষমতা দিয়ে জয় করা আজও মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু তবু দেখা যায় কৃতী গোলকীপাররা সময় সময় তাদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে পেনাল্টি কিক্ বাঁচান। অন্যান্য গোলকীপারের মত পেনাল্টি কিকের আগে উদ্যমহীন ও উত্তেজিত না হয়ে, শান্ত মনে তারা বোঝবার চেষ্টা

করেন—বিপক্ষ পোষ্টের কোন দিকে বল কিক্ করবে। এ বিষয়ে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসবার পর, তারা তাদের সব দৃষ্টিটা দেন কেবল মাত্র বলের উপর। বিপক্ষের শরীর অথবা পায়ের উপর দৃষ্টি চলে গেলে, সিদ্ধান্তে গোলমাল হবার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে যেমন, তেমনি আজকের ফুটবলাররা তাদের পায়ের একই জায়গা দিয়ে বলকে সোয়ার্ভ করিয়ে পোষ্টের দুকোণেই মারতে পারেন বলে কেবলমাত্র বল ও বলের গতিবিধির উপরই গোলকীপারের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি রাখা উচিত।

যে সব গোলকীপারের উচ্চতা ছয় ফুটের উপর বা কাছাকাছি, তারা তাদের দুই হাতকে দুদিকে সম্পূর্ণ ছড়িয়ে. এমন ভঙ্গীতে দাঁড়ান যে বিপক্ষের ফুটবলার অনেক সময় পোষ্টে ফাঁকা জায়গা না খুঁজে পেয়ে. গোলকীপারের হাতে অথবা গোলকীপারের সাধ্যের ভিতরই পেনাল্টি কিক্ করেন।

যে সব গোলকীপার অতটা লম্বা নন—তারা কোন এক পোষ্টের দিকে শরীর বেঁকিয়ে এমন ভাবে দাঁড়ান, যাতে বিপক্ষের মনে হতে পারে যে উনি বিশেষ করে ঐদিকে ঝাঁপাবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছেন। আসলে কিন্তু তা নয়। তিনি পুরোপুরি নিজেকে প্রস্তুত রেখেছেন উল্টোদিকে লাফাবার জন্য। এবং এই ফাঁদে যদি বিপক্ষ পা দেয় তাহলে সেই গোলকীপারের পক্ষে পেনাল্টি কিক্ অনেক ক্ষেত্রেই বাঁচিয়ে দেওয়া সম্ভব।

কর্ণার কিক্

পেনাল্টি কিকের মত সোজা বিপক্ষের গোলকীপারকে পরাস্ত করে. গোল করার সহজ সুযোগ কর্ণার কিকে নেই। তবুও গোল করার মত কিছু সুযোগ কর্ণার কিক্ থেকে সৃষ্টি করা সম্ভব।

গোলকীপাররা যখন গোল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে গোল রক্ষা করতেন, এবং ব্যাক এরিয়ার ভিতর ডিফেন্সের খেলোয়াড়েরা আজকের মত যখন এত আঁট-সাঁট ভাবে খেলতেন না. তখন কর্ণার কিক্ থেকে গোল করা আজকের তুলনায় অনেক সহজ ছিল। তখনকার উইঙ্গাররা ব্যাক এরিয়ার ভিতর বল লব্ করতেন. এবং ফরোয়ার্ডদের ভিতর যিনি যথেষ্ট উঁচুতে লাফানর সঙ্গে হেডিং-এ পারদর্শী হতেন. তিনি দাঁড়ানো অবস্থা থেকে লাফিয়ে. অথবা পিছন থেকে ছুটে এসে লাফিয়ে. বলে সঠিক হেড করলে গোল হবার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু গোলকী-পাররা যখন থেকে গোল লাইন ছেড়ে. বলের গতিপথ অনুযায়ী ব্যাক এরিয়ার ভিতর বেরিয়ে এসে বল গ্রিপ্ করতে লাগলেন অথবা ঘুঁষি মেরে বল বার করে দেওয়া সুরু করলেন. তখন থেকে একজনের হেড করে গোল করাটা কিছুটা কমে গেল। এর উপর আত্মরক্ষার্থে. দলের (গোলকীপার এবং দুইজন উইং ব্যাক ছাড়া) বাকী আটজন খেলোয়াড নিজেদের ব্যাক এরিয়ায়. বিপক্ষের খেলোয়াড়দের যখন আঁটসাঁট ভাবে পাহারা দিতে সুরু করলেন অথবা বিপক্ষের একজনের বিরুদ্ধে স্বপক্ষের তিন-চারজন একই সঙ্গে লাফাতে সুরু করলেন তখন একজনের পক্ষে কর্ণার কিক্ থেকে হেড করে গোল করা দারুণ শক্ত হয়ে উঠল।

আক্রমণকারীরা তখন থেকে আবার বিপক্ষের এই আঁটসাঁট নজর ভেঙে কর্ণার কিক্ থেকে গোল করবার জন্যে নতুন কায়দার কথা ভাবতে সুরু করলেন এবং সাফল্যও লাভ করলেন।

আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়দের বিপক্ষ খেলোয়াড়রা গুছিয়ে দাঁড়াবার আগেই,

কর্ণার কিক্ করবার চেষ্টা করতে হবে। কেননা আত্মরক্ষার্থে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ভালভাবে দাঁড়াবার সময় দিলে কর্ণার কিক্ থেকে গোলের সুযোগ সৃষ্টি করা বেশ শক্ত। এইসঙ্গে আক্রমণকারীর যে খেলোয়াড়টি কর্ণার কিক্ করবে তাকে হাওয়া কোন দিকে বইছে, সেই দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। হাওয়া যদি স্বপক্ষে থাকে এবং সবেগে বহে, তাহলে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে গোলকীপারের, বলের গতিপথ সঠিকভাবে বিচার করা দুরূহ হয় বলে, কর্ণার কিক্ থেকে সিধেসিধি গোল করা সম্ভব।

দলের উইংগাররা সাধারণতঃ সেন্টারিং-এ সুদক্ষ হয় বলে, তাদেরকেই কর্ণার কিক্ করতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। তবে এ বিষয়ে কোন পাকাপাকি নিয়ম না রাখাই উচিত। কেননা কর্ণার কিকে বৈচিত্র্য আনবার জন্য আজকের ফুটবলে, বলকে ইনসাইড ও আউটসাইড সোয়ার্ভ করান হচ্ছে এবং হাঁটু সমান উচ্চতায় এত সুতীব্র বেগে বল কিক্ করা হচ্ছে, যার উপর স্বপক্ষের কেউ গোল অভিমুখে পা বলকে স্পর্শ করালেই, বল তীব্রবেগে গোলের ভিতর ঢুকে যাবে। কাজেই উইংগার ছাড়াও দলের অন্য কোন খেলোয়াড় যদি এই জাতীয় শক্ত কিকিং-এ সুদক্ষ হয় তাহলে সেই খেলোয়াড়কেই কর্ণার কিক্ করতে দেওয়া চলতে পারে।
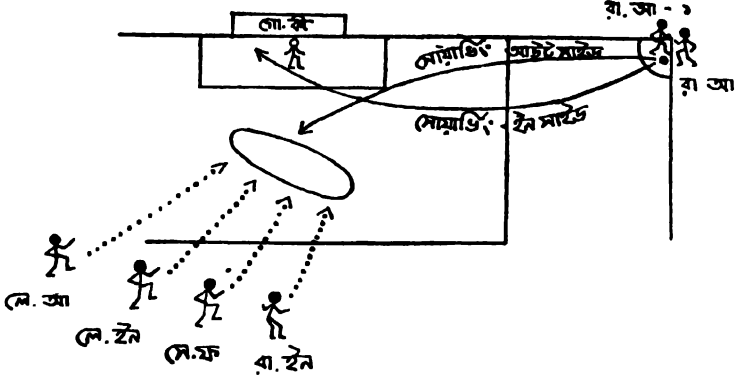
এক নম্বর ছবি

এক নম্বর ছবিতে দুই ধরনের কর্ণার কিক্ দেখানো হচ্ছে। এখানে রাইট আউট তার ডান পা দিয়ে 'ইনসাইড সোয়ার্ভিং' ও 'আউটসাইড সোয়ার্ভিং' কিক্ করছে। বিপক্ষের গোলকীপার যদি কর্ণার কিকের সময় গোলপোস্টের মাঝামাঝি দাঁড়ায়—তাহলে এই ছবিতে দেখানো গোলকীপারের পিছন দিকের ফাঁকটুকুর সুযোগ নেবার জন্য রাইট আউট 'ইনসাইড সোয়ার্ভিং' কিক্ ব্যবহার করলে সিধেসিধি গোল পেতে পারে। এবং এই সময় যদি হাওয়া স্বপক্ষে থাকে, তাহলে গোল করাটা আরও সহজ হয়। তবে এই জাতীয় কিক্ প্রচণ্ড অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। সেই তুলনায় রা-আ-১-এর মত বাঁ পা দিয়ে ঐ জাতীয় কিক্ করা অনেকটা সহজ। কিন্তু গোলকীপার যদি সামনের এবং পিছনের পোস্টে দুই উইং ব্যাককে দাঁড় করিয়ে দেয়—তাহলে এই ইনসাইড সোয়ার্ভিং কিক্ থেকে গোল করা বেশ শক্ত হয়ে ওঠে।

এক সময় কর্ণার কিকে নিজেদের একজন খেলোয়াড়ই হেড করতে উঠতেন। কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে রাইট আউট—আউটসাইড সোয়ার্ভিং কিক্ এমন ভাবে করছে যাতে বল পেনাল্টি বক্সের অল্প বাইরের দিক দিয়ে গিয়ে ব্যাক-এরিয়ার মাঝখানে পড়ে, এবং এর ফলে বিপক্ষের গোলকীপারের পক্ষে বল পেনাল্টি বক্সের বাইরে দিয়ে চলে যাওয়ায়, গ্রিপ করা বা পাঞ্চ করা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি আক্রমণকারীর নিজ দলের চারজন খেলোয়াড় একই সংগে লাফাচ্ছে বলে, ওদের ভিতর যে কোন একজনের পক্ষে হেড করবার পুরোপুরি সুযোগও রয়েছে।
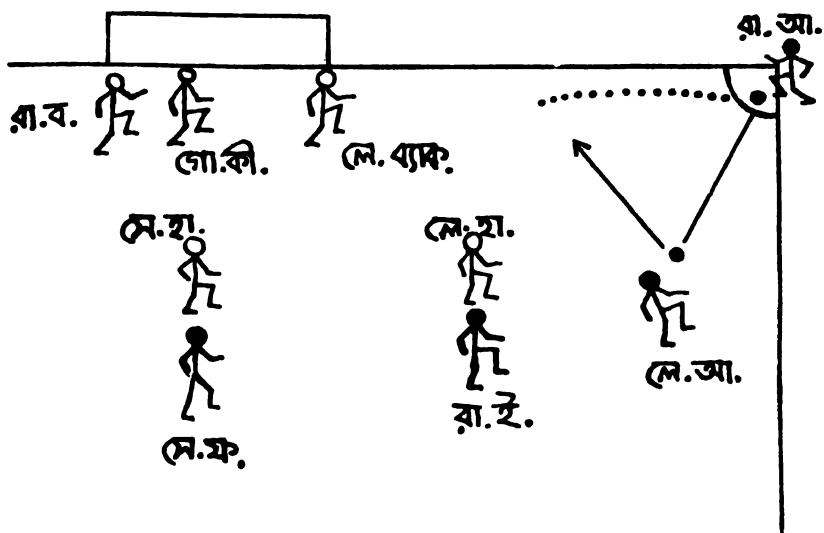
দুই নম্বর ছবি

দলে যদি ভাল হেডার না থাকে, এবং বিপক্ষের গোললাইন যদি সুরক্ষিত ও সেই সঙ্গে নিজ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই (এই দুই নম্বর ছবিতে প্রদর্শিত) আঁটসাঁটভাবে নজর রাখা হয়—তাহলে ব্যাক এরিয়ায় উঁচু করে বল ফেলে কর্ণার কিক না করাই উচিত। সেই অবস্থায় কি ধরনের কর্ণার কিক করলে, গোল-উপযোগী আক্রমণ রচনা সম্ভব, তারই একটি নমুনা এখানে দেখানো হচ্ছে। লেফ্‌ট আউট তার নিজস্ব জায়গা ছেড়ে রাইট আউটের পাশে চলে এসেছে। লেফ্‌ট আউটের উপর নজর রাখবার যার দায়িত্ব, বিপক্ষের সেই রাইট ব্যাকের পক্ষে নিজের জায়গা ছেড়ে এতদূর আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই রাইট আউট বল লেফ্‌ট আউটকে পাস করেই বিন্দু বিন্দু লাইন ধরে বিপক্ষের গোলের কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছে। লেফ্‌ট আউট সেই বল ট্র্যাপ না করে, তীর চিহ্নিত জায়গায় রাইট আউটকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এবং এই বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ফলে গোল করার সুযোগও যথেষ্ট বাড়বে।

তিন নম্বর ছবি

তিন নম্বর ছবিতে কর্ণার থেকে 'লো-ফ্লাইট' কিকিং-এর একটি নজির দেখানো হচ্ছে। এখানে রাইট আউট এমন ভাবে কর্ণার কিক্ করছে, যাতে বল সুতীব্রগতিতে হাঁটু বরাবর উচ্চতায় আসবে। কিন্তু এই কিক্ নেবার আগে আক্রমণকারীর রাইট ইনকে ফাঁকা জায়গা তৈরী করবর জন্য রাইট আউটের দিকে ছুটতে হবে, এবং বিপক্ষের লেফ্‌ট হাফও তার পিছন পিছন যাবে। এখন রাইট আউট ঐ ফাঁকা জায়গায় লো-ফ্লাইট কিক্ করলে, পিছন থেকে রাইট হাফ ছুটে, রাইট হাফ-১-এর জায়গায় এসে, ঐ চলন্ত বলে গোল-অভিমুখে পা লাগালেই বল সুতীব্র-গতিতে গোলের ভিতর ঢুকে যাবে, বা ঢুকে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

কর্ণার কিক্ থেকে ব্যাক এরিয়ার ভিতর উঁচু করে তোলা বল আজকের গোলকীপারের পক্ষে গোললাইন থেকে বেরিয়ে, গ্রিপ বা পাঞ্চ করে, একশোটার ক্ষেত্রে নিরানব্বইটাই বাঁচান সম্ভব হলেও, বলে যদি ইনসাইড অথবা আউটসাইড সোয়ার্ভ থাকে তাহলে এই কাজটি গোলকীপারের পক্ষে মোটেই সহজ নয়। কেননা এই ধরনের কিকিংএ বল তার গতিপথে কখন এবং ঠিক কতটা বেঁকবে, তা আগে থাকতে আন্দাজ করে স্থির-সিদ্ধান্তে আসা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই গোলকীপার যদি এ ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে বল ধরতে যায়, তাহলে তাকেও ভুলের মাশুল দিতে হতে বাধ্য। আউটসাইড সোয়ার্ভিংএ বল ব্যাক এরিয়ার দিকে যায় বলে দলের পক্ষে ততটা বিপজ্জনক নয়, কিন্তু ইনসাইড সোয়ার্ভিং-এ বল গোলের ভিতর ঢুকে গোল করে দিতে পারে বলে, গোলকীপারকে এ জাতীয় শটের সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

তাই, সোয়ার্ভিং শটে বলকে খুব মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে করতে একেবারে শেষ মুহূর্তে খেলোয়াড়কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গোলকীপার কর্ণার কিকের, বিশেষ করে 'ইনসাইড সোয়ার্ভিং কিক'এ তড়িঘড়ি এগিয়ে না গিয়ে, নিজে ও দুই পোষ্টে তার দুই ব্যাককে (দুই নম্বর ছবির মত) গোললাইনের উপর দাঁড় করিয়ে বলকে গোলের ভিতর ঢুকতে না দেবার চেষ্টা করবে।

কর্ণার কিকের সময় আক্রমণকারীর মাথা থেকে শুধু হেড করে বল বার করে দেবার আশায়, বিপক্ষের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকলেই প্রতিরক্ষাকারীর পক্ষে আজকাল আর গোল বাঁচান সম্ভব নয়। কেননা বর্তমানে কর্ণার কিক এক রকম না হয়ে—বিভিন্ন ধরনে নেওয়া হচ্ছে বলে প্রতিরক্ষাকারীকে সব রকম আক্রমণের আশায় নিজেদেরকে গতিশীল করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; এবং এই সময়ে স্বদলের ফরোয়ার্ডদেরও পিছনে এসে ডিফেন্ডারদের সাহায্য করতে হবে। যেমন, কর্ণার থেকে বিপক্ষের উইংগার (দুই নম্বর ছবিতে প্রদর্শিত) যখন 'ওয়াল-পাস' করছে তখন প্রতিরক্ষাকারী দলের লেফ্ট উইংগারের কর্তব্য হবে, পিছনে এসে বিপক্ষের লেফট উইংগারকে সেই পাসটি রাইট আউটের কাছ থেকে নিতে না দেওয়া।

ফ্রি কিক্

আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়েরা একসময় ফ্রি-কিক্ থেকে শট্ নিতে অনেকটা সময় নিতেন, তা মাঠের যে কোন জায়গা থেকেই হোক না কেন। বলকে স্থির অবস্থায় বসিয়ে, বেশ খানিকটা পিছনে হেঁটে—তারপর সেখান থেকে ছুটে এসে, উঁচু করে দূরের স্বখেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বল কিক্ করাই ছিল সেদিন-কার ফ্রি কিক থেকে আক্রমণ রচনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বল উঁচু করে লম্বা পাসিং-এর বদলে কাছাকাছি ফাঁকা স্বখেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট পাসিং, যখন আগের পদ্ধতির তুলনায়, অনেক বেশী ফলদায়ী বলে স্বীকৃতি পেল, তখন থেকেই বিপক্ষের ব্যাক-এরিয়ার কাছ ছাড়া (যেখান থেকে সিধেসিধি কিক করে গোল করা সম্ভব) মাঠের অন্য জায়গায় ফ্রি কিক করার পদ্ধতিটা গেল পাল্টে। অর্থাৎ দ্রুত নিজের কাছাকাছি ফাঁকা স্বখেলোয়াড়কে পাস করে আক্রমণকে গতিশীল রাখার পদ্ধতিটাই চালু হল।

ব্যাক এরিয়ার আশপাশ থেকে, সিধেসিধি গোলে কিক্ করে ফ্রি কিক্ থেকে গোল করার চেষ্টা, আজও ফুটবল ম্যাচে ভুরি ভুরি দেখা যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ থেকে কোন গোল পাওয়া যায় না। কেননা এই কিক্ নেবার সময় বিপক্ষের চার পাঁচজন খেলোয়াড় পরস্পর ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে, মানুষের দেওয়াল বানিয়ে গোলপোষ্টের একটা দিক ঢেকে রাখেন এবং পোষ্টের অন্য দিকটা ঢেকে রাখেন বিপক্ষের গালকীপার নিজে। এই অবস্থা থেকে গোল করতে হলে, গোলকীপারের ফেলে রাখা পোষ্টের অন্য কোণটুকু থেকে একমাত্র সোয়ার্ভিং কিকেই গোল করা সম্ভব। কিন্তু এত দূরপাল্লার শটে বলকে নিখুঁত সোয়ার্ভিং করান কেবলমাত্র গুটিকয়েক কৃতী ফুটবলারের পক্ষেই সম্ভব। তাই বর্তমানে, ফ্রি কিকে বিপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে আক্রমণ তৈরী করার কিছু নতুন কায়দা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আক্রমণকারীর দুজন খেলোয়াড়ই একই সঙ্গে ফ্রি কিক্ করতে ছুটে আসবে। প্রথম জন বলের উপর দিয়ে লাফিয়ে সামনে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়জন ঐ আড়ালটুকুর সুযোগ নিয়ে গোলে কিক্ করবে।

এক নম্বর ছবি

ফ্রি কিক্ থেকে দু ধরনের আক্রমণ তৈরীর কায়দা এই এক নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে। রাইট হাফ ফ্রি কিক শট নেবার ঠিক আগের মুহূর্তে, রাইট আউট—রাইট আউট-১-এর পোজিশন লক্ষ্য করে বিন্দু বিন্দু লাইন ধরে দৌড়চ্ছে এবং রাইট হাফ তীর চিহ্নিত জায়গা ধরে বল রাইট আউটকে পাস দিয়েছে এবং রাইট আউট সেই বল কিক্ করে তীর চিহ্নিত লাইন ধরে গোল করছে।

আক্রমণকারীর সেন্টার ফরোয়ার্ড, স্বপক্ষের রাইট হাফের ফ্রি কিক্ থেকে শট্ নেবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে. ফ-১-এর জায়গায় ছুটে এসেছে, এবং রাইট হাফ সে. ফ-১-কে বল পাস করেই, রাইট হাফ-১-এর জায়গায় চলে গেছে। সে. ফ-১ তখন সেই বল সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিয়েছে তীরচিহ্নিত লাইন ধরে রা. হা-১-এর দিকে এবং রা. হা-১ স্পট বল তীরচিহ্নিত লাইন ধরে কিক্ করে বিপক্ষের গোলকীপারকে পরাজিত করছে।

গোলকীপার স্বখেলোয়াড়দের দ্বারা ঢেকে থাকায়, অনেক খেলায় দেখা গেছে, ব্যাক এরিয়ার আশেপাশে প্রতিরক্ষাকারী দল ফ্রি কিক্ থেকে গোল বাঁচাবার জন্য পাঁচ-ছয়জনের দেওয়াল করা সত্ত্বেও গোল খেয়েছে। তাই প্রতিরক্ষাকারী দলের গোলকীপারের এই দেওয়াল তৈরীর আগে, দলের খেলোয়াড়দের জানানো উচিত যে কোন দিকে দেওয়াল তৈরী করলে তার পক্ষে বলকে শেষ পর্যন্ত নজর রাখতে ও অনুসরণ করতে বিশেষ সুবিধা হবে। এবং এই নির্দেশের পরই, গোলকীপার পোস্টের যে দিকটা নিচ্ছে—তার উল্টো দিকে দেওয়াল তৈরী করা উচিত। এই দেওয়াল তিন থেকে ছয়জন খেলোয়াড় পর্যন্ত তৈরী করতে পারে। তবে সবাইকেই একে অন্যের কনুইয়ের ভিতর কনুই দিয়ে, অথবা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে, ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে দাঁড়াতে হবে, যাতে বিপক্ষ এই দেওয়ালের ভিতর কোন ফাঁকের সুযোগ না পায়। অনেক খেলোয়াড় এই দেওয়ালে দাঁড়িয়ে (বল অন্ডকোষে

লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকায়) দু হাতের পাতা দিয়ে নিজের অণ্ডকোষ ঢেকে রাখে। এই সতর্কতা নিঃসন্দেহে খেলোয়াড়কে চোটের হাত থেকে বাঁচাবে।

ফ্রি কিকের বিরুদ্ধে শুধু মানুষের দেওয়াল তুলে. নিশ্চিন্ত হলে, প্রতিরক্ষাকারী দলকে ঠকতে হবে। এই প্রসঙ্গে এক নম্বর ছবিতে প্রদর্শিত আক্রমণকারীর ফ্রি কিক্ থেকে আক্রমণধারা রুখতে হলে—প্রতিরক্ষা দলের সব খেলোয়াড়কেই সজাগ ও সতর্ক হয়ে, প্রতিটি বিপক্ষের খেলোয়াড়ের উপর নজর রাখতে হবে—যাতে বিপক্ষের কেউ কোনরকম ফাঁক সৃষ্টি করে গোলে কিক্ না নিতে পারে।

ফুটবলের বিবর্তন ও ট্যাক্‌টিকস

ইতিহাস মানেই বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ। চলতি বাংলায় যাকে বলা চলে পালা-বদলের রোজনামচা—তা মানুষের নিজের অথবা তার ধর্ম, বিজ্ঞান, কৃষ্টি, যুদ্ধ. যুদ্ধের হাতিয়ার কিংবা খেলাধুলোর, যারই হোক না কেন. কোথাও তার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার নজির নেই—তার চেয়ে উপায় নেই বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। কোথাও সে এগিয়েছে আপন সৃষ্টিশীলতার প্রচণ্ড আবেগের বন্যায়, কখনও গোঁড়ামির তীব্র কুসংস্কারে অন্ধকারে মুখ থুবড়ে শয্যাশায়ী, আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনই তাকে অবিরত ঠেলা মেরে সামনের দিকে এগোতে বাধ্য করেছে। ইতিহাসের এই চলমানতা বা গতিশীলতার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষিত ব্যক্তিদের মত ফুটবলারেরও থাকা উচিত—অন্য বিষয়ের উপর না হলেও অন্ততঃ তার নিজের বিষয়—এই ফুটবলের উপর। কেননা আঁকাবাঁকা বহু বিচিত্র পথ পার হয়ে আসা নদীর মতই—ফুটবলও পাল্টাতে পাল্টাতে আজকের এই রূপ নিয়েছে। আর এই রূপান্তরের পরতে পরতে তৈরী হয়েছে নতুন নতুন আইনকানুনের সঙ্গে সঙ্গে. নতুন নতুন ক্রীড়াকৌশল বা ট্যাক্‌টিক্‌স।

ব্রিটিশ ফুটবল সমালোচক টেরেন্স ডিলানি তাঁর 'এ সেনচুরি অব সকার' বইতে লিখছেনঃ "ট্যাক্‌টিক্‌সের ব্যাপারটা কিন্তু অন্য ধরনের। বিবর্তনের গতিপথে অবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রয়োজন উদ্ভূত হয়—তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া আর কি। ফুটবলের ট্যাক্‌টিক্যাল প্ল্যান আসে—ডব্লিউ এম, ৪-২-৪ অথবা বোল্ট—যাই হোক না কেন—তা এসেছে শুধু একজন কাগজে-কলমে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছকে. তারপর তাকে মাঠে অনুশীলন করিয়েছে বলেই নয়। প্রথমত তারা এসেছে বাস্তব সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করতে গিয়েই. তারপর এসেছে বিশ্লেষণ থিওরি।"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল সমালোচক উইলি মিজেল "ফুটবলের অগ্রগতি—হুইল" নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখছেনঃ "১৯২৫ সালের নতুন অফ সাইড নিয়মের প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত 'প্ল্যানড ফুটবল' কার্যত সকলের অজানা ছিল।

"উল্লেখ করবার মত প্ল্যানিং শুরু হল হার্বার্ট চ্যাপম্যান যখন থার্ডব্যাকের কথা চিন্তা করলেন। কারও কারও অবচেতন মনে যে এর প্রয়োজনের কথা ওঠেনি তা নয়। বিশেষ করে চালাক সেন্টার হাফ-রা বিশেষভাবেই অনুভব করত যে অফ-সাইডের এই নতুন আইন ফরোয়ার্ডদের এতটা সুবিধা দিয়েছে যে ডিফেন্সকে আরও শক্ত করে গড়ে তুলতে না পারলে—শক্তির ভারসাম্য কিছুতেই

থাকছে না। তারা যখন তাদের স্বভাব দিয়ে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিল—চ্যাপম্যান ঠিক তখন সেটাকেই মুখ্য চিন্তা এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাফল্যের রূপ দিল।......

"এখন একটা ট্র্যাক্‌টিক্যাল মুভ অপরটির জন্ম দিতে শুরু করল।"

কখন এবং কোথায় ফুটবল প্রথম চালু হয়েছিল? এ বিষয়ে আজ অনেক দেশই দাবিদার। চীন বলে—তারই দেশে প্রথম। সাক্ষ্যপ্রমাণস্বরূপ তারা দাখিলও করে একটি নানা রঙের ছবি, যাতে বিচিত্র বেশভূষায় এক চীনা একটি বেতের বলে কিক্‌ করছে।

ইটালিয়ানরা বলে—'ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে তাদের দেশে। যে ফ্লোরেন্‌টাইন পোষাক পরে এই খেলাটি খেলত তার নাম ছিল 'ক্যালসিও'। বলটা তৈরী হত পশুর লিভার থেকে। বলের নাম 'প্যালোনি'।

ব্রিটিশরা কিন্তু আরও একটু এগিয়ে বলে, 'আমরা এ খেলা শুরু করেছিলাম চতুর্দশ শতাব্দীতে—তবে ধরনটা ছিল অন্য রকমের, অর্থাৎ খানিকটা বর্বর। যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের মাথাটা কেটে—তাকেই বল হিসেবে ব্যবহার করে পৃথিবীতে আমরাই প্রথম ফুটবল চালু করেছিলাম।'

কিন্তু যে যাই বলুক না কেন, ফুটবল যে প্রাচীন তা দুটো প্রাচীন সভ্য দেশ ব্যাবিলন এবং মিশরে এ খেলার চল দেখেই প্রমাণ হয়। গ্রীক কবি হোমারের 'অডেসি'তেও এ খেলার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে। গ্রীক সভ্যতার গোড়ার দিকে অবশ্য এই ফুটবলের নাম ছিল 'হার্পাস্টোন'। এবং এ খেলা হতো হাত এবং পা দুই দিয়েই। অনেকটা আজকের 'রাগবী'র মত। সেদিন স্পার্টান বীরদের কাছেও এ খেলা ছিল অতি অবশ্য এবং যুদ্ধের ট্রেনিং-এর প্রধান অঙ্গ। স্পার্টান কালচারের সঙ্গে সঙ্গে এই খেলা সমগ্র গ্রীস ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে রোমান সভ্যতায়। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মিশরী লেখক জুলিয়াস পোলারের লেখাতে রোমান ফুটবলের যে সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে, তার অনেকটাই পরিষ্কার-ভাবে আজকের আমাদের ফুটবল খেলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর রোমান সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপ জুড়ে যে অন্ধকার নামল—যাকে ঐতিহাসিকরা নাম দিয়েছেন 'ডার্ক এজ', সেই যুগে হার্পাস্টোন হারিয়ে গেল। সারা মধ্যযুগ ধরে মুখ লুকিয়ে কোনমতে টিমটিম করে বেঁচে থাকল ইটালিতে—যার নাম ছিল 'ক্যালসিও'।

কিন্তু এ সব-কিছুকে ছাপিয়ে বর্তমান ফুটবলের যে রূপ, তার প্রচলনের পুরোপুরি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে নিঃসন্দেহে ইংল্যাণ্ড। রোমান সৈন্যদের কাছ থেকে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা এ খেলা শিখে তাকে এত তাড়াতাড়ি একটা সুন্দর রূপ দেয় যে, রাজা দ্বিতীয় এডোয়ার্ড থেকে আরম্ভ করে তখনকার ইংল্যাণ্ডের ব্যবসাদাররা পর্যন্ত এর জনপ্রিয়তায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেদিনের খেলাটা শুধু এগারোজনের সঙ্গে অন্য এগারোজনের ছিল না। ছিল একটা গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের, এক শহরের সঙ্গে অপর শহরের, কিংবা একটা জাতির সঙ্গে অন্য জাতির। এ খেলা চলাকালীন রাস্তার দু' ধারের ব্যবসাদারদের কাঁচের শো-কেস ভাঙত, সেই সঙ্গে ভাঙত অসংখ্য খেলোয়াড়দের হাত-পা, যার ছিল না হিসেব। সেই সঙ্গে এ খেলা এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, তীর ছোঁড়ায় আর কারও উৎসাহ রইল না। রাজার সৈন্যদলে সৈন্যের পড়ল টান। কাজেই নানা কারণে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় এডোয়ার্ড তাঁর রাজ্যে এ খেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিলেন।

কি দরকার ছিল!”

এ ব্যাপারে আমি আর কি করতে পারি বলুন। তখনও দু'দলের দু'রঙের জার্সি পরবার কোন নিয়মই ছিল না। দেখছেন না, নিজেদের দলের খেলোয়াড়ের পেছনেই বাঁই বাঁই করে তাড়া করে তার থেকে বল কেড়ে নিতে গিয়ে খেলোয়াড়টি লজ্জায় বলে উঠছে, “আমি আন্তরিক দুঃখিত। ভেবেছিলাম আপনি আমাদের বিপক্ষের খেলোয়াড়।”

খেলা দেখে বিরক্ত হচ্ছেন? হয়ত সহ্য না করতে পেরে চীৎকার করে উঠলেন, “আরে গাধা, আশেপাশে তোর আট আটটা ফরোয়ার্ড ঘোরাফেরা করছে, তাদের বলটা পাস দে না। বলটা ঠিক সময়মত ঠিক লোককে ছাড়তে শেখ—তবেই না ফুটবলার!”

কিন্তু আমাদের দর্শক ভুলে গিয়েছেন যে তিনি একশো বছর আগেকার এক ফুটবল খেলা দেখছেন। তখন ত বল ছাড়বার কোন প্রশ্নই উঠত না। যে একবার বলটা পেল, সে বিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে, বল ড্রিবল করতে করতে চলল—যতক্ষণ না পর্যন্ত বল তার অধিকারের বাইরে যায়। আর মজার ব্যাপার হল, তার স্ব দলের খেলোয়াড়রাও তার কাছ থেকে বল ঘন ঘন কেড়ে নিত। অর্থাৎ বল নিজের অধিকারে রেখে ড্রিবল করাই ছিল সেদিনকার ফুটবল খেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এরই ইংরাজী নাম—'ড্রিবলিং গেম।'

যাক্। এ খেলা যে আমাদের দর্শককে খানিকটা হাসাতে পেরেছে তা দেখেও আমি খুশী। হাসির কারণটা অবশ্যই এমন কিছু নয়। বলটা একজন খেলোয়াড়ের পায়ের পাতায় লেগে একটু বেশী ওপর দিকে চলে গিয়েছিল—যার ফলে খেলোয়াড়টি বলটিকে কিছুতেই কণ্ট্রোল করতে পারছিল না, তাই দু হাত দিয়ে বলটিকে নামিয়ে নিয়ে আবার পা দিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। অথবা কোন খেলোয়াড় ছুটে গিয়ে লাফিয়ে শূন্যের বলকে দু' হাত দিয়ে পাকড়ে ধরল—একে ইংরাজিতে বলা হয় 'ফেয়ার ক্যাচ'। তারপরই সে তার গোড়ালি দিয়ে ঐখানের খানিকটা মাটি খুঁড়ে বলকে বসিয়ে দিল। একে ইংরাজিতে বলা হয়—মার্ক। এবং আইনত সেই খেলোয়াড়টি এর পর সেই বলে ফ্রী কিক শট্ নিতে পারত। এ সবই অবশ্য ছিল সেদিনের আইনের আওতায়। তবে সবচেয়ে মজার ছিল থ্রো-ইনের সময়। বল যেই মাঠের বাইরে গেল, অমনি দু'দলের খেলোয়াড়রাই ছুটল সে বল ধরবার জন্য। বলটিকে আগে যে ধরতে পারবে—সেই থ্রো করতে পারবে। থ্রো করতে হবে এক হাতে। এবং সেই বল যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ড্রপ খাচ্ছে—ততক্ষণ কেউই সে বল ধরতে পারবে না।

এবার কিন্তু আমাদের দর্শকটি ঘাবড়ে গিয়েছেন। মনে মনে ভাবছেন, এই ত' খেলা শুরু হল, এরই মধ্যে বিরতি!

আজ্ঞে না। ওটা বিরতি নয়। তখনকার নিয়ম ছিল গোল হলেই তা যে-কোন পক্ষই করুক, উভয় পক্ষকে দিক বদলাতে হবে।

১৮৬৩ সালে প্রথম তৈরী হল ফুটবল খেলার আইন-কানুন।

১৮৬৩ সালেও যে ফুটবল খেলা হতো তাতে খেলত নয় জন ফরোয়ার্ড, একজন হাফ ব্যাক ও একজন ব্যাক। গোলকীপারের পাত্তাই নেই। অর্থাৎ গোল বাঁচান নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু দু' বছর যেতে না যেতেই টনক নড়ল। আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য একজনের অবশ্যই গোল পোস্টে থাকা দরকার। আর এই দরকারই ১৮৬৫-তে গোলকীপার সৃষ্টি করল। অবশ্য এর জন্য আজকের

মত তাকে অন্য ধরনের ইউনিফর্ম পরতে হত না। ১৮৭০ সালে দেখা গেল একজন ফরোয়ার্ড কমে গেছে। অর্থাৎ ৭টা ফরোয়ার্ড, ২টা হাফ-ব্যাক, একটি ব্যাক এবং গোলকীপার।

১৮৭৫ সালে আবার খেলোয়াড় সাজাবার ছক পালটালো। ৬জন ফরোয়ার্ড, ২জন হাফ, ২জন ব্যাক এবং গোলকীপার।

১৮৮৩ সালে কিন্তু আক্রমণ এবং রক্ষণ একটা ভারসাম্য পেল। তখন গোলকীপার+দু'জন ব্যাক+তিনজন হাফব্যাক+পাঁচজন ফরোয়ার্ড। ১৮৬৩ থেকে '৮৩ পর্যন্ত সাজাবার ছকে এই ভারসাম্য আসতে (নানান বৈচিত্র্যের মাঝখান দিয়ে) সময় লাগল কুড়ি বছর। আর এই ছকের ঝোঁকটা আক্রমণ ও রক্ষণে সমানভাবে চারিয়ে যাওয়ায় খেলা উদ্দেশ্যহীন আক্রমণ থেকে ক্রমশ সুনিয়ন্ত্রিত ভঙ্গি পেল। ফুটবল পণ্ডিতরা এই ছককেই আধুনিক ফুটবলের বনিয়াদ হিসাবে সম্মান দিয়ে থাকেন। ফুটবল খেলার আইন সম্পূর্ণ করতে যেখানে এফ-এ অব ইংল্যাণ্ডের লেগেছে কুড়ি বছর অর্থাৎ ১৮৬৩ সাল থেকে ১৮৮২ সাল, সেখানে ট্যাকটিকসের একটি মাত্র বৈচিত্র্য আনতেই মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। এই পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর সমস্ত ফুটবলারই একটি মাত্র ট্যাকটিকসই শিখেছে যে, 'ড্রিবলিং গেম' আর যাই করুক তাকে জেতাতে পারবে না। আর এই অমূল্য সত্যটা প্রতিষ্ঠিত করতে আন্তর্জাতিক ম্যাচে স্কটল্যাণ্ডের কাছে ইংল্যাণ্ডকে হারতে হয়েছে চোদ্দটার ভেতর নয়টা। এই সত্য আরও প্রতিষ্ঠিত হল ওভাল মাঠে ১৮৮৩ সালে দুর্ধর্ষ ইটোনিয়ন্স ক্লাবকে হারিয়ে ব্ল্যাক বার্ন অলিম্পিক যখন এফ এ কাপ জয় করল। গোল দেওয়া এবং বাঁচানোর জন্য নির্দিষ্ট কোন পন্থার রূপায়ণে বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা—যাকে বলা হয় ট্যাকটিকস—তখনই প্রথম শুরু হল।

'পাসিং গেম' অর্থাৎ বল দেওয়া-নেওয়া করে খেলার পদ্ধতি হারিয়ে দিল ড্রিবলিং গেমকে। সারা পৃথিবীতে আস্তে আস্তে এই সত্য ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল।
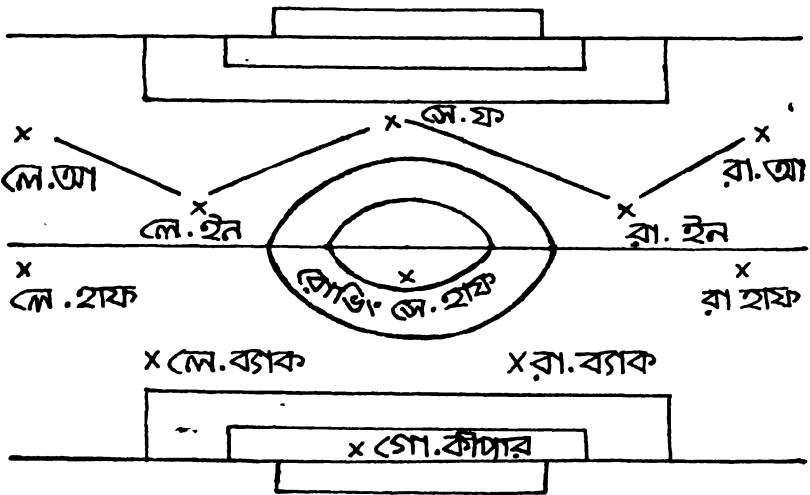
(এক নম্বর ছবি)

এক নম্বর ছবিতে ১৯৩০-দশকের আগে পর্যন্ত (ভারতে অবশ্য ১৯৫৬ পর্যন্ত) পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত 'রোভিং সেণ্টার হাফ' ৫-৩-২ অর্থাৎ পাঁচ ফরোয়ার্ড, তিন হাফ এবং দুই ব্যাক প্রথায় খেলার ছক দেখান হয়েছে। একে সংক্ষেপে 'W-W' সিস্টেমও বলা হত। এ প্রথায় লেফ্‌ট আউট, সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং রাইট আউট থাকত এগিয়ে, দুটি ইনসাইড তাদের পিছনে। দুই উইংগার বল নিয়ে তীব্রগতিতে কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছে গিয়ে উঁচু করে গোলের মুখে সেণ্টার করত। এবং সেই বল সেণ্টার ফরোয়ার্ড হেড করে বা তীব্র কিকে গোল করত। দুটো ইনসাইডের কাজ যদিও ছিল মধ্য মাঠ থেকে বল নিয়ে ড্রিবল করে হাফ ও ব্যাকের মাঝখান দিয়ে নিজের উইংগারকে অথবা সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে থ্রু বাড়ানো—তবু কিছু কিছু ইনসাইড দূর থেকে অথবা ড্রিবল করতে করতে বিপক্ষের গোল এরিয়ার ভেতর ঢুকে গোলও করত। দুইজন সাইড হাফের কাজ ছিল বিপক্ষের দুজন উইংগারকে পাহারা দেওয়া। তারা সময় সময় আক্রমণে যে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে যেত তা নয়, কিন্তু বিপক্ষের উইংগার তীব্র গতিসম্পন্ন হলে, এ কাজটা খুবই বিপদের হত। সেণ্টার হাফের খেলা ছিল সেদিন সবচেয়ে শক্ত। তাকে একদিকে—মাঠময় ঘুরে ঘুরে খেলবার জন্য যেমন দারুণ খাটিয়ে হতে হত, তেমনি নিজের ফরোয়ার্ডদের বল জোগান দেওয়ার কাজে সুদক্ষ হওয়া ছিল একান্তই দরকারী। কেননা তারই বল জোগানর ওপর পাঁচটি ফরোয়ার্ড নির্ভর করত। প্রয়োজন বিশেষে তাকেই আবার পেছিয়ে গোল লাইনে এসেও গোল বাঁচাতে হত। দুজন ব্যাক, ব্যাক এরিয়ার উপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একে অপরকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত কভার করে খেলত। গোলকীপারকে বলা হত গোল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে খেলতে। একদম শেষ পর্যন্ত সে গোল বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারবে এই ধারণাতেই এ ধরনের উপদেশ তাকে দেওয়া হত। লাইন ছেড়ে এগিয়ে আসাটাকে কেউই সেদিন বরদাস্ত করত না। কিন্তু এতদিনকার জনপ্রিয় এই সিস্টেমটাকে শেষ পর্যন্ত ভাঙতে হল। মজার ব্যাপার, গোল খাওয়ার হাত থেকে নিজের টীমকে বাঁচাবার তাগিদটা যার মাথায় প্রথম এল—ডিফেন্সের কোন খেলোয়াড় নয়—অফেন্সেরই একজন—ইংল্যাণ্ডের আর্সেনাল ক্লাবের ইনসাইড চার্লস বুকান। আর্সেনালের কোচ-কাম ম্যানেজার তখন হার্বার্ট চ্যাপম্যান। শুধু ব্রিটেনের নয়, সারা পৃথিবীর ফুটবল ইতিহাসে হার্বার্ট চ্যাপ-ম্যানের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সেদিন (১৯২৭ সাল থেকে '৩০ সালের) কোন এক প্রদোষের অন্ধকারে হার্বার্ট চ্যাপম্যান নিজের ঘরে বসেছিলেন। কপালে চিন্তার কুঞ্চন। দুদিন পরই লীগের এক গুরুত্বপূর্ণ খেলা। তার উপর বিপক্ষের সেণ্টার ফরোয়ার্ডটি রীতিমত ভয়াবহ। রোজই তিন চারটে করে গোল করছে। তাকে কি করে থামান যায়!

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন চার্লস বুকান। ম্যানেজারকে বললেন, "আপনাকে দু চারটে কথা বলতে চাই। আপনি অনুমতি দেবেন কি?" চ্যাপম্যান ঘাড় নেড়ে রাজী আছেন জানাতেই বুকান বললেন, "দেখুন, অফ সাইডের নতুন আইন সাহায্য করছে বিশেষভাবে ফরোয়ার্ডদেরই। যার ফলে খেলা তার আজ ভারসাম্য হারিয়েছে। এখন ডিফেন্সকে শক্ত করে আমাদের সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে না আনতে পারলে আমরা কিছুতেই খেলায় জিততে পারব না।" চ্যাপম্যান তখনও সন্দিগ্ধ। উদাস কণ্ঠে বললেন "কি করলে ডিফেন্সের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা

যায়?" বুকান কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, "আপনি সেণ্টার হাফকে পিছনে নিয়ে এসে দুটো ব্যাককে পাশে ঠেলে দিন। আর দুটো হাফকে মাঝখানে নিয়ে আসুন।"

চ্যাপম্যান যেন একটু আলো দেখতে পেলেন। তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। প্রশ্ন করলেন, "তুমি তিনটে ব্যাক করতে চাইছ?" বুকান ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ। মাঝখানের ব্যাকটার পুরোপুরি কাজ হবে বিপক্ষের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে বল ধরতে না দেওয়া। এক কথায় পুলিসম্যানের কাজ। সেণ্টার ফরোয়ার্ড যদি মাঠের বাইরে প্রস্রাব করতে যায় তাহলে সেও সঙ্গে সঙ্গে যাবে, বাড়ি গেলে তার বাড়ি। আর দুটো সাইড ব্যাক আগলাবে বিপক্ষের দুজন উইঙ্গারকে, কাজেই মাঝখানের ফাঁক থেকে যে গোলগুলো হচ্ছিল সেগুলো আর হবে না।" চ্যাপম্যান বললেন, "তা নয় হল, কিন্তু আক্রমণ?" বুকান আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে এবার বললেন, "কেন, দুজন হাফ ব্যাক। তারা একদিকে বিপক্ষের ইনসাইডকে পাহারা দেবে, সেই সঙ্গে বল জোগাবে দ্রুত ইনসাইডকে। ফাঁক পেলে লম্বা উঁচু বল বাড়িয়ে দেবে নিজের আউট ও সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দিকে। এতে নিঃসন্দেহে আক্রমণ আরও জোরদার হবে। দেখুন, আগের সিস্টেমে আক্রমণে যাচ্ছিল ছয়জন। পাঁচজন ফরোয়ার্ড ও একজন সেণ্টার হাফ। কিন্তু এ সিস্টেমে যাচ্ছে সাতজন। পাঁচজন ফরোয়ার্ড ও দুজন সাইড হাফ। আবার ডিফেন্সের ক্ষেত্রেও পাচ্ছেন সাতজন। পাঁচজন ডিফেন্স তো রয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে দুজন ইন সাইড পেছিয়ে এসে সাহায্য করবে ডিফেন্সকে।"
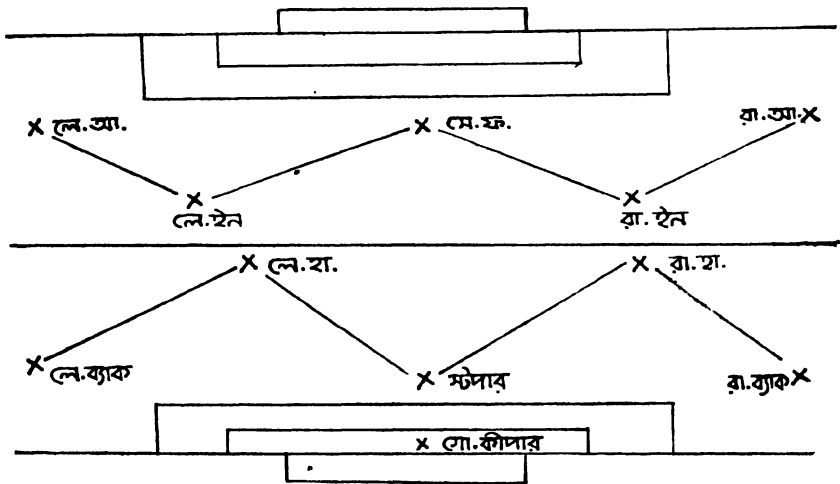
(দুই নম্বর ছবি)

দুই নম্বর ছবিতে থার্ড ব্যাক-সিস্টেমে কোন খেলোয়াড় কোথায় খেলবে তারই ছক দেওয়া হল। সংক্ষেপে এই প্রথাকে আজ ৫-২-৩ বা 'W-M' বলা হয়। এই সিস্টেম শুধু যে ডীপ ডিফেন্সে একজন খেলোয়াড় বাড়িয়েছে তাই নয়। ডিফেন্সের সব খেলোয়াড়কেই একটা নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে 'মার্কিং প্রসেস' প্রথা চালু করেছে। যেমন লেফ্‌ট ব্যাক রাইট আউটকে, লেফ্‌ট হাফ রাইট ইনকে, রাইট হাফ লেফ্‌ট ইনকে, রাইট ব্যাক লেফ্‌ট আউটকে এবং থার্ড ব্যাক বা স্টপার বিপক্ষের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে পুরোপুরি গার্ড দেবে। এই যে একজনের বিপক্ষে একজনের পাহারা দেওয়া, একেই বলা হয় ম্যান-টু-ম্যান মার্কিং।

ফুটবল ইতিহাসে এই প্রথম এসে মিশল গঙ্গা-যমুনা। একজন দিল মাটির অভিজ্ঞতা—অপরজন বুদ্ধি। যার ফলে জন্ম নিল—থার্ড ব্যাক সিস্টেম। আর এই সিস্টেমে খেলে চ্যাপম্যানের আর্সেনিল সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়ে দিল।

১৯৩৪ সালে হার্বার্ট চ্যাপম্যানের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু হল বটে, কিন্তু মৃত্যু হল না থার্ড ব্যাক সিস্টেমের। এ সিস্টেম তার দেশ পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে সর্বস্বীকৃত সিস্টেম হিসেবেই প্রচলিত হল, যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণডংকা বেজে উঠল।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল। দীর্ঘ ছ'টা বছর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া বেজেছে পৃথিবী জুড়ে। আশ্চর্যের বিষয়—রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর শান্তি নামলেও মানুষের যুদ্ধ জয়ের ইচ্ছেটার কিন্তু ইতি হল না। রণাঙ্গনের বদলে এবার যুদ্ধ শুরু হল ১২০×৮০ গজের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে। বুলেটের বদলে পাঁচ নম্বর চামড়ার বলে। বিশ্বজয়ের স্বপ্ন এবার যার চোখে মায়াকাজল টানল, সে কিন্তু জার্মানী নয়—হাঙ্গারী। কিন্তু স্বপ্ন দেখাটা যত সহজ তাকে কাজে পরিণত করার ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়। সেদিনের হাঙ্গারীর ফুটবল অধিনায়ক ফেরেঙ্ক পুসকাস তার আত্মজীবনী "ক্যাপ্টেন অব হাঙ্গারী"তে লিখছেন, "আন্তর্জাতিক ফুটবলে হাংগারীকে একেবারে প্রথমের সারিতে আসতে হলে—খেলার সম্পূর্ণ এক নতুন পদ্ধতি বার করতে হবে। কেননা একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, যে প্রথায় এখন আমরা খেলছি—তা শীর্ষে ওঠবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। অনেকে ট্র্যাডিশনের উল্লেখ করেন—কিন্তু আজ সকলে মেনেই নিয়েছেন যে ওটার কোন মূল্য নেই। আজকের হাঙ্গারীর কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, কি উপায়ে বিপক্ষের চেয়ে বেশী গোল করা যায় সেইটে বের করা—তাতে যদি খেলার সৌন্দর্য একটু-আধটু ব্যাহত হয় তা হলেও ক্ষতি নেই।"

সমস্যাটা ধরতে পারলেও—তার সমাধানের পথটা ছিল কিন্তু বহু মতে বিভক্ত। সেই বিষয়েই তাই তিনি লিখছেন, "একদল ইংরেজদের পদ্ধতি—গতি এবং নানান ধরনের পাসিং-এর মাধ্যমে বলকে গতিশীল করাটাই পছন্দ করছিল। তাদের দাবি ছিল খেলোয়াড়দের শরীর হবে দারুণ শক্ত-সমর্থ এবং যাদের মূল কাজ হবে বিপক্ষের গোলে বলটা ঢুকিয়ে দেওয়া। আসলে তারা খেলোয়াড় চাইছিল না—তা সে যত দক্ষই হোক না কেন। কেননা এই সমস্ত দক্ষ খেলোয়াড়রা খালি ট্যাকটিকস নিয়েই সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করবেন অথবা তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত ক্রীড়া-কৌশলের মান উন্নত করার দিকেই সতত সচেষ্টা হবেন।

আর একদল বলছিল, মধ্য ইয়োরোপের বুদ্ধিযোগে ফুটবল খেলায় যে ট্যাকটিকস সেই পদ্ধতিটাই নেওয়া উচিত। কেননা এদের খেলা সব রকম দর্শকের কাছেই নয়নমনোহর। এবং এদের ট্রেনিং পদ্ধতি, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ড্রিবল, ফেনট এবং ট্যাকলিঙ ক্ষমতাকে বাড়ানো, যা বিপক্ষের শারীরিক দক্ষতাকে অনায়াসেই হার মানাবে।

সবশেষের যে দলটি, তারা ইটালীর সাফল্যের দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুক্তি দেখাচ্ছিল যে, ফুটবলারকে শুধু ফুটবলার হলেই চলবে না—তাকে অ্যাথলীটও হতে হবে। কেননা ফুটবলারের যদি তার নিজের শরীরের ওপর সম্পূর্ণ কণ্ট্রোল থাকে তাহলে খেলার যে কোন অবস্থায়—তা সে যত গতিশীল অথবা ভয়াবহ হোক না কেন—তারই ভেতর থেকে সে তার সঠিক রাস্তাটি চিনে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে।"

এই প্রসঙ্গের পরেই পুসকাস লিখছেন, "এইসব থিয়োরীর নিশ্চয় ভাল ভাল দিক ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনটাই হাঙ্গারীর সমস্যা সমাধান পুরোপুরি ভাবে করতে পারেনি। আমরা বারবার অনুভব করছিলাম যে আমাদের একটা আলাদা নতুন ধরনের সিস্টেম চাই।"

হাঙ্গারীর এই নতুন সিস্টেমে খেলার সব কর্তব্যগুলো সুষমভাবে টীমের এগারোজনের ভেতর চারিয়ে দিয়ে একাত্মতার যে ভাবরূপ তৈরী করা সম্ভব—সে আদর্শকে প্রথম খেলায় রূপ দিলেন গুস্তাভ সিবেস এবং তাঁর সহকারীরা। কাজটাকে সম্পূর্ণ রূপদান করতে তাঁকে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি তা নয়— তবু তিনি দমে যাননি। নানান ধরনের বাধা পেরিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি একে পূর্ণতার রূপ দিয়েছেন।

সেদিনের হাঙ্গারীর জাতীয় কোচ গুস্তাভ সিবেসকে প্রথমেই থার্ড ব্যাকের গলদগুলো তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার করতে হয়েছে। সারা বিশ্বে শুধু প্রচলিত পদ্ধতি বলেই একে তিনি মেনে নেননি। এই বিষয়ে পুসকাস লিখছেন, "যুদ্ধের ইতিহাসে ট্যাক্‌টিক্‌সই হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় যা যুদ্ধ জেতায়। ফুটবল খেলার বেলাতেও এ বিষয়টা সমান প্রযোজ্য। ধরা যাক, দুটো সমান ক্ষমতা-সম্পন্ন টীম মাঠে নেমেছে, কিন্তু কে জিতবে? নিশ্চয় তারাই--যারা ট্যাক্‌টিকসে বেশী উন্নত। গুস্তাভ সিবেসও তাই থার্ড ব্যাকের উপরই এমন কতগুলো নতুন অপ্রত্যাশিত মুভ্‌ তৈরী করলেন যা বিপক্ষের খেলোয়াড়রা আগেভাগে কিছুতেই ধরতে পারবেন না। পৃথিবীর সব দেশের দাবা খেলোয়াড়রাই যেমন দাবার মুভ-গুলো এক নজরেই চিনে ফেলে—থার্ড ব্যাকের ট্যাক্‌টিকসকেও এক নজরে ধরা যায়।

"থার্ড ব্যাক সিস্টেমটি দাঁড়িয়ে আছে দুটি ইনসাইড ও দুটি উইং হাফের কাঁধের উপর ভর দিয়ে। অর্থাৎ এই চারজন উঠানামা করে টীমের ভারসাম্য ঠিক রাখছে। গোলকীপার, দুটো সাইড ব্যাক এবং স্টপারের একমাত্র কাজ ডিফেন্স করা আর দুটো উইঙ্গার ও সেন্‌টার ফরোয়ার্ডের কাজ পুরোপুরি আক্রমণ। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই তাদের নিজস্ব জায়গা নিয়েই খেলছে এবং যতদূর পারে তারা তাদের কাজটুকু করতে পারলেই খুশী। ১৯২৬ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত এ সিস্টেমে আক্রমণে বিশেষ বৈচিত্র্য না আসাতে খেলাটা বিরক্তিকর পর্যায়ে পোঁছেছে। যদিও ডিফেন্সটা খানিকটা এ সিস্টেমে দুর্ভেদ্য হয়েছে।"

কিন্তু কি সেই সিস্টেম যা ১৯৪৯ সাল থেকে '৫৬ সাল পর্যন্ত হাঙ্গারীকে পৃথিবীর এক নম্বর টিমে রূপান্তরিত করেছিল! হাঙ্গারী প্রচলিত 'উইথড্রল-সেনটার ফরোয়ার্ড' প্রসঙ্গে পুসকাস লিখছেন, "প্রথমেই আমরা ঠিক করলাম যে উইং হাফ ও ইনসাইডের ওপর অতিরিক্ত শ্রমের (যা তাদের খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত করে) চাপটা আমরা যতদূর পারি সারা টিমের খেলোয়াড়দের ভেতর চারিয়ে দেব। এবং আক্রমণটা শুরু করব ডিফেন্স করতে করতেই। অর্থাৎ আক্রমণ ও ডিফেন্সটা এমনভাবে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলবে, যাতে পুরো টিমটাই সর্বদা সক্রিয় থাকবে।

গোলকীপারের শুধু গোল পোস্টটুকু পাহারা দিয়ে আর গোল আটকিয়েই ফুরিয়ে যাবে না। পিছন থেকে সমস্ত খেলাটাই দেখতে পায় বলে, তাকে প্রয়োজনমত ব্যাক এরিয়ার উপরে উঠে এসে বল বার করতে হবে, এবং আক্রমণের সময় তাকে তাড়াতাড়ি স্ব-খেলোয়াড়ের পায়ে বলটি জুগিয়ে দিতে হবে—যাতে আক্রমণটা তৈরী হতে বিশেষ সুবিধা হয়।
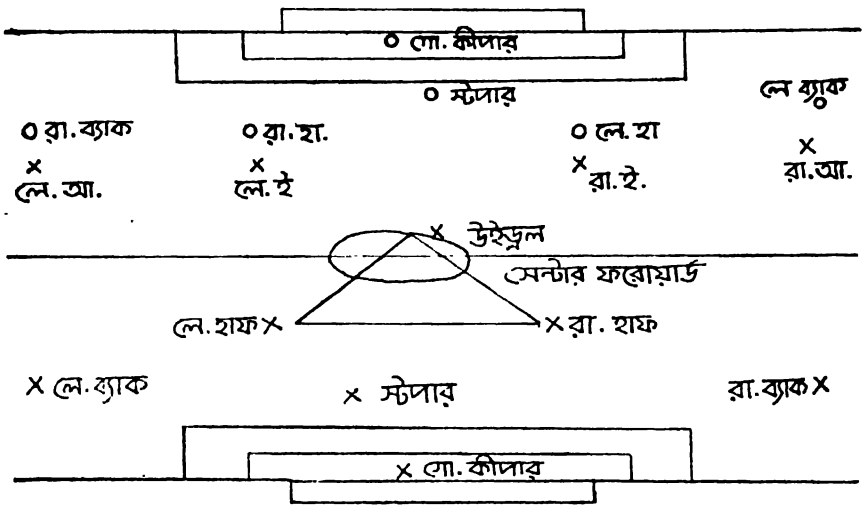
(তিন নম্বর ছবি)
'উইথড্রল সেন্টার ফরোয়ার্ড' সিস্টেম

ফুল ব্যাক দুজনকে এমনভাবে আক্রমণ ঠেকাতে হবে যাতে বল বিপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পুরোপুরি আক্রমণ করতে পারে। শুধুমাত্র পেনাল্টি বক্সের ভিতর গোল বাঁচাবার জন্য সে এলোপাথাড়ী বল মেরে দিতে পারবে।

হাফ-ব্যাকদ্বয়ের খেলা থার্ড ব্যাকের মতই রইল। শুধু একজন যখন আক্রমণে গেল অন্যজন প্রতিরক্ষার জন্য পিছনে থাকবে।

উইং ফরোয়ার্ডদের খেলায় এল অনেক পরিবর্তন। আক্রমণের সময় তারা যথারীতি লাইন ধরে আক্রমণে সহায়তা করবে। আবার প্রয়োজনে নিজের ব্যাককে সাহায্য করবার জন্য তাকে নিজের ব্যাক এরিয়ার উপর নেমে আসতে হবে ও আক্রমণের সময়ে সেন্টার ফরোয়ার্ডের জায়গা—মধ্য মাঠেও যেতে হবে।

থার্ড ব্যাকের মত এ সিস্টেমে ইনসাইড দুজন কিন্তু পিছনে পড়ে খেলবে না। তাদের প্রথম কাজই হবে গোল করা অর্থাৎ তারা পুরোপুরি স্ট্রাইকার। সেই সঙ্গে তারা বিপক্ষের ব্যাক ও হাফব্যাকরা যাতে আরামে তাদের ফরোয়ার্ডকে বল জোগাতে না পারে—সে চেষ্টাও করবে।

এ সিস্টেমে সেন্টার ফরোয়ার্ডের খেলাটাই অদ্ভুত ধরনের। সে সব সময়ে বিপক্ষের স্টপারের কাছ থেকে অনেকটা দূরে থাকবে অর্থাৎ মধ্য মাঠে। তার কাজ হবে মূলত নিজের ডিফেন্ডারদের কাছ থেকে বল নিয়েই আক্রমণ রচনা করা এবং আক্রমণ করতে করতেই বিপক্ষের গোল এরিয়ার ভেতর ঢুকলেই তৎক্ষণাৎ গোলে কিক্ করা। সেই সঙ্গে বিপক্ষের যে কোনো একজন হাফ-ব্যাককেও তাকে নজর রাখতে হবে। আক্রমণ রচনার সময় সেন্টার ফরোয়ার্ড মাঠের সর্বত্র জায়গা বদল করতে পারে।"

আজকের ফুটবল বিশেষজ্ঞরা হাঙ্গারী প্রবর্তিত এই উইথড্রল সেনটার ফরোয়ার্ড সিস্টেমটার সংক্ষেপে নাম দিয়েছেন ৩—৩—৪। এবং সেদিনের এ সিস্টেমের সাফল্যের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন যে, একদিকে হাঙ্গারী যেমন চারজন ফরোয়ার্ড দিয়ে অনায়াসে তিনজন ব্যাককে বোকা বানিয়েছে, অন্যদিকে মধ্য মাঠেও দু'জন হাফের বদলে সাহায্য পেয়েছে তিনজন হাফ ব্যাকের।

ব্রাজিলে ফুটবল খেলার সুরু গত শতাব্দীর শেষ দিকে। ১৮৮৮ সালে ব্রাজিলে দাস প্রথা উঠে গেলে ওদেশের ক্রীতদাস—নিগ্রো আর মুলাটোরা আত্ম-প্রকাশের একটা মাধ্যম খুঁজে পেল—ফুটবলে।

১৯১১ সালে আই. এফ, এ শীল্ড জয় করেই—আমরা যখন আত্মতুষ্ট তখন আমাদের সঙ্গেই খেলা সুরু করে. ব্রাজিল ফুটবলে বিশ্ববিজয়ী হবার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৯৩০ থেকে বিশ্ব কাপে অংশ গ্রহণ করেও তারা সাফল্য লাভ করতে পারছিল না। ১৯৫০ সালে বিশ্ব কাপের ফাইন্যালে—ব্রাজিলের বিরাট মারাকানা ষ্টেডিয়ামে দুই লক্ষ সমর্থক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল. ব্রাজিলকে বিশ্ব বিজয়ীর ভূমিকায় দেখবে বলে। কিন্তু সমস্ত আশাকে নস্যাৎ করে দিয়ে. উরুগুয়ে সে খেলায় ব্রাজিলকে ২—১ গোলে হারিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ যখন জিতে নিয়ে গেল. ব্রাজিলের সমর্থকরাও সেইদিন থেকে ষ্টেডিয়ামের পথ মাড়ান বন্ধ করে দিল। ব্রাজিল ফুটবলের কর্মকর্তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে ফুটবলকে নিজের দেশে বাঁচিয়ে রাখতে. ব্রাজিলকে যে কোরেই হোক বিশ্ববিজয়ী হতেই হবে। আর এই 'যে করেই হোক' বিশ্ব বিজয়ী হোতে গিয়ে ১৯৫৪ সালে সুইজারল্যান্ডে বিশ্ব কাপের খেলায় হাঙ্গারীর কাছে হেরে, ব্রাজিলিয়ান ফুটবলাররা খেলার পর ড্রেসিং রুমের আলো ভেঙে, অন্ধকারের সুযোগে হাঙ্গারীয়ান খেলোয়াড়দের কিল, চড়. ঘুঁষি ও বুটের ষ্টাড দিয়ে মারধর করে বিকৃত ও অখেলোয়াড়োচিত ব্যবহারের যে কলঙ্কিত ইতিহাস সৃষ্টি করল—তা বোধহয় কোনদিন মুছবে না।

ব্রাজিল-ফুটবল এবার অন্যদিকে মোড় নিল। ডাক পড়ল এমন একজনের. যার ফুটবল সম্পর্কে জ্ঞান সুস্পষ্ট। ফিওলার হাতে তুলে দেওয়া হল ব্রাজিল টীমের সব ভার। ব্রাজিলের বিশ্ববিজয়ীর ভূমিকা প্রসঙ্গে ফিওলা 'ব্রাজিল বুক অব ফুটবলে' লিখছেন—"আমার আসার আগে ব্রাজিল টীমে ফুটবলের সঙ্গে যারা কোনোরকমে জড়িত ছিল না, তারাও টীমের সঙ্গে বিদেশ সফরে যেত। এবং এরাই বিদেশে গিয়ে নিজেদের বিকৃত চরিত্রের দ্বারা খেলোয়াড়দের নৈতিক আদর্শ ভেঙে দিত। আমার প্রথম কাজই হল এটাকে পুরোপুরিভাবে বন্ধ করা। এর আগে ব্রাজিল যদি খেলাতে হারত, তাহলে বলা হত ডিডির জন্যই টিমটা হারল। কেননা, ডিডি ভাল খেলতে পারেনি। আর যদি ব্রাজিল জিতত, তাহলে বলা হত. এটা ডিডিরই জয়। কেননা, ডিডির ভাল খেলার জন্যই ব্রাজিল জিতেছে। তাই আমার কাজ হল ব্যক্তিপুজোর প্রতি এই অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গীটাকে বন্ধ করে দেওয়া—তা একটা খেলোয়াড়ের খেলায় যতটুকু অবদানই থাক না কেন। আসলে আমি মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করছিলাম যে, এই 'স্টার-সিস্টেম'কে অতিক্রম না করতে পারলে এবং টিমে, আসল সামগ্রিকতা বোধ না আনতে পারলে কিছুতেই সুইডেনের ১৯৫৮ সালের ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা জিততে পারব না। .এরপরই আসছে ট্যাক্‌টিক্‌সের প্রশ্ন। কোচ হিসেবে এ কথা আমি হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি যে, খেলোয়াড়দের মানসিকতার ওপরই

ট্যাক্‌টিক্‌সের অনেকখানি সাফল্য নির্ভর করে। ফুটবল ট্যাক্‌টিক্‌সকে বিচার করতে বসলে আমার এ যুক্তি কেউই উড়িয়ে দিতে পারবে না। স্বভাবের দিক থেকে ইউরোপীয়ানরা ঠান্ডা মেজাজের ও যুক্তিগ্রাহী। এবং অনেক সহজেই তারা খেলার বিভিন্ন সিস্টেমকে আত্মস্থ করতে পারে। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড়রা ঠিক এর উল্টো। এরা স্বভাবের দিক দিয়ে দারুণ আবেগে প্রচন্ড গতিশীল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কোন বাঁধাধরা ছকে নিজেদের খেলাকে সমর্পণ করতে একবিন্দুও উৎসাহী নয়। কিন্তু তবু আমাকে চেষ্টা করে যেতে হল, যাতে মোটামুটি টীমে একটা সিস্টেম আনা যায়—যাতে নিয়মও থাকবে, সেই সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক ক্রীড়াশৈলীতেও বিশেষ আঘাত লাগবে না। এবং এর ফল আমি হাতে হাতেই পেলাম।"

মোরেইরা ছিলেন ফিওলার সহকারী। সুইডেনে ব্রাজিলকে ৪—২—৪ প্রথায় খেলতে দেখে সাংবাদিকরা মোরেইরাকে প্রশ্ন করেছিল, "আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন না যে, আপনার এই চারটি ব্যাক রাখাতে আপনার আক্রমণ বিভাগ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে! আর এই চারটি মাত্র ফরওয়ার্ড নিয়ে কি ব্রাজিল বিজয়ী হতে পারবে?"
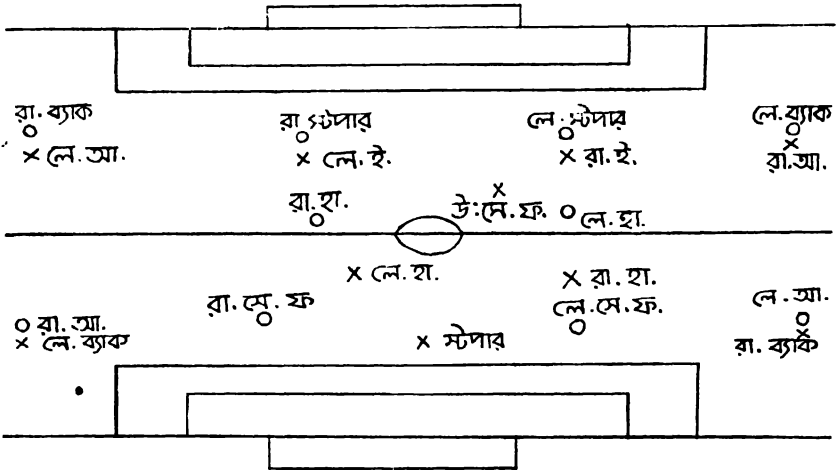
(চার নম্বর ছবি)

হাঙ্গারী প্রবর্তিত 'উইথড্রন সেন্টার ফরওয়ার্ড'কে রুখতে গিয়ে ব্রাজিলকে করতে হল ৪—২—৪ প্রথা। এই ৪—২—২ সিস্টেমে, বিপক্ষের ফরওয়ার্ডকে আটকে রাখছে যেমন চারজন ব্যাক (গোল্লা দেওয়া), তেমনি তিনজন ব্যাকের বিরুদ্ধে চারজন ফরওয়ার্ডের গোল করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

মোরেইরা উত্তরে বলেছিলেন, "কে বিজয়ী হবে তা বলতে পারব না, তবে আমাদের ছকটা আপনাদের মোটামুটি বুঝিয়ে বলতে পারি। যেমন গোলকীপার একশো ভাগ ডিফেন্সিভ। চারটি ব্যাক বিপক্ষের চারটে ফরওয়ার্ডকে আটকে খেলবে। তাদের কাজ হবে ৭৫ ভাগ ডিসেন্সিভ এবং ২৫ ভাগ আক্রমণাত্মক। একজন সাইড ব্যাক যখন আক্রমণে যাবে কিংবা বিপক্ষের ফরওয়ার্ড যখন তাকে কাটিয়ে

নেবে তখন তাকে কভার করবে তার ঠিক পাশের স্টপার। দুজন স্টপারও এমনি একজন এগিয়ে এবং অপরজন তাকে কোনাকুনি কভার করে খেলবে। একমাত্র অফসাইড ট্রাপ করবার সময় ছাড়া, তারা কখনও পাশাপাশি দাঁড়াবে না। পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে খেললে মাঝখান দিয়ে থ্রু পাস হবার সম্ভাবনা আছে এবং যার পরিণতি গোল। হাফব্যাকদ্বয়ের কাজ হবে আক্রমণ—৫০, রক্ষণ—৫০। এবং চারজন ফরওয়ার্ড আক্রমণাত্মক—৭৫ ভাগ ও রক্ষণ—২৫ ভাগ।"

এবার ক্রীড়াসাংবাদিকরা প্রশ্ন তুলেছেন—"অতবড় মাঠে মাত্র চারটে ফরওয়ার্ড কি থৈ পাবে?"

মোরেইরা হেসে বলেছেন—"মটর গাড়ির গতির সংগে প্লেনের গতির তুলনা সম্ভব? মোটর গাড়ির ড্রাইভারকে প্লেনে বসিয়ে দিলেই কি প্লেন চলবে? প্লেনের গতির সুবিধাটুকু পেতে হলে পাইলটের দক্ষতা অনস্বীকার্য নয় কি? আমাদের এই ৪—২—৪ প্রথায় খেলতে গেলেও তেমনি চারটি সুনিপুণ বল-প্লেয়ার, যাকে বলা হয় কমপ্লিট ফুটবলার—তাই থাকা দরকার, তা না হলে এ ছকে খেলার কোন উপকারিতাই অন্য দেশ পাবে না।"

১৯৫৮ সালে ব্রাজিল ৪—২—৪-এর যে বিশেষ সুবিধাটুকু আদায় করে নিতে পেরেছিল, সেটুকু আর পাওয়া যে সম্ভব নয়—তা ১৯৬২ সালে চিলির বিশ্বকাপের প্রস্তুতির শুরুতেই বুঝতে পারা গিয়েছিল। ৪—২—৪ প্রথা সারা ইয়োরোপে ততক্ষণে যথেষ্ট পরিচিত এবং ইয়োরোপীয়ান ট্যাকটিসিয়ানরা কাটা-ছেঁড়া করে এর দোষগুণগুলোও বার করে ফেলেছে। ব্রাজিল তাই অনুভব করল যে তার আবার নতুন কোন ছক বিশ্বের সামনে রাখতে হবে যা সবাইকে চমক দেবে। এ ছাড়াও ব্রাজিলের খেলোয়াড় এবং কর্মতর্কাদের এবার আরও বেশী দায়িত্ব। এর আগের বারে তাদের অধিবাসীরা আশা করেছিল যে তারা বিজয়ী হলেও হতে পারে। কিন্তু এবার তাদের দাবী যে ব্রাজিল বিশ্ববিজয়ী হবেই। তাই ব্রাজিলকে এবার আরও রক্ষণাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হল। ব্রাজিল খেললে তিন ফরোয়ার্ডে, তিন হাফব্যাকে এবং চারটে ব্যাকে। অর্থাৎ ৪—৩—৩ প্রথায়।

মানুষের যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়, কখনো কখনো একটি মাত্র লোক তার অসামান্য বুদ্ধি, ধৈর্য ও পরিশ্রম দিয়ে তার জাতিকে জিতিয়ে দিয়েছে। তেমনি ফুটবল ট্যাকটিকসের ক্রমবিবর্তনের মাঝে মাঝেও দেখতে পাই যে একটি মাত্র খেলোয়াড় তার অসামান্য শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টায় একটা সিস্টেমকে সাফল্যের দরজায় পেঁছে দিয়েছে। হাঙ্গারীর 'উইথড্রল সেণ্টার ফরোয়ার্ড' সিস্টেমে সেদিন যদি সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিদেইকুটি না থাকত তাহলে হয়ত এ সিস্টেম অতটা সাফল্যমণ্ডিত হত না। ব্রাজিলের ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের বেলাতেও লেফট আউট মেরিয়া জাগালোর ভূমিকা তেমনি। একই সংগে তিনি পিছনে নেমে এসে রক্ষণভাগকে সাহায্য করেছেন—আবার পিছন থেকে বল নিয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ফরোয়ার্ডকে আক্রমণে সাহায্য করেছেন। মেরিয়া জাগালোর সাফল্যের জন্য আর একটি সিস্টেমের সেদিন জন্ম হল যা ৪—২—৪-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ৪—২—৪-এর সাফল্য নির্ভর করছিল দুটো হাফব্যাকের ক্রীড়াচাতুর্যের উপর। তারা অসফল হলে ফরোয়ার্ডরা যেমন বল পাবে না, তেমনি চারজন ডিফেণ্ডারও বিপক্ষের ছয়জন খেলোয়াড়ের আক্রমণের চাপ সহ্য করতে পারবে না। ৪—৩—৩, প্রথার সুবিধা যে মধ্য মাঠে তিনজন খেলোয়াড় থাকায় বিপক্ষের দুজন হাফ

ব্যাককে পরাভূত করলেই বিপক্ষের আক্রমণ ও রক্ষণ ভাগ একই সঙ্গে ভেঙে পড়বে এবং এর ফলে খেলায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে।
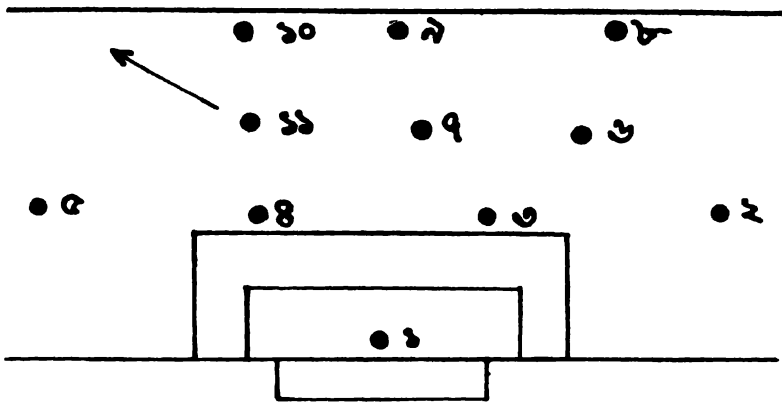
(পাঁচ নম্বর ছবি)

পাঁচ নম্বর ছবিটি ব্রাজিলের ৪—৩—৩ সিস্টেমের। ইংল্যাণ্ডের কোচ আলফ র‍্যামসে এই পদ্ধতিরই একটু অদল-বদল করে ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কাপ জয় করেন। তিনি যে ৪—৩—৩ প্রথার আশ্রয় নেন তাতে সামনে তিনটি ফরোয়ার্ড—লেফট আউট, সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং রাইট আউট থাকবে। এবং পিছনে থাকবে তাদের তিনটি হাফব্যাক। এবং সবশেষে থাকবে চারটে ব্যাক।
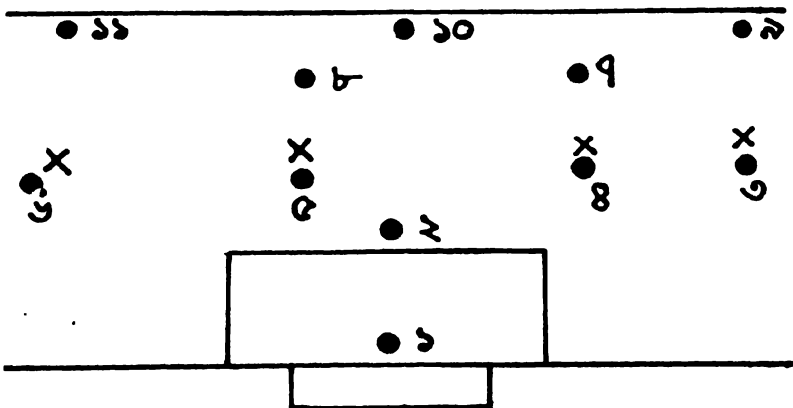
(ছয় নম্বর ছবি)

এই ছবির ছককে বলা হয়—সুইপার সিস্টেম। গত শতাব্দীর শেষ থেকেই অস্ট্রিয়া ছিল ফুটবলে খুব উন্নত। তাদের আবিষ্কৃত সিস্টেমটাই পরে সুইজারল্যাণ্ড কিছুটা বদল করে নাম দেয় 'সুইস বোল্ট'। এ প্রথায় দুজন উইংহাফের কাজ দুজন উইঙ্গারকে নজর রাখা ও দুজন মাঝখানের ব্যাকের কাজ একদম পেছিয়ে খেলে একটা নেটের বা জাল সৃষ্টি করা। এবং পাঁচ নম্বর অর্থাৎ মাঝখানে যিনি খেলবেন তিনি বল সমেত বিপক্ষের খেলোয়াড়কে তাড়া

দিয়ে নিয়ে আসবেন চারজনের রচিত এই জালের ভিতর, যার ছিল বল কেড়ে নেওয়া সম্ভব। এই সিস্টেমটাকেই আরও পরিমার্জিত করে নেয় মধ্য ইয়োরোপের দেশগুলো এবং ল্যাটিন আমেরিকার উরুগুয়ে। প্রধানত এ সিস্টেমের উদ্ভব ৪—২—৪ প্রথাকে রোখবার জন্যই। চারটে ফরোয়ার্ডকে সব সময় চারটে ডিফেন্ডার দিয়ে রোখা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বিপক্ষের কোন ফরোয়ার্ড যদি কৃতী হয়। এই চারটি ফরোয়ার্ডকে চারটে ডিফেন্ডার দিয়ে আটকে রাখবার দায়িত্ব দিয়েও সব পিছনে একজনকে রাখা হয়েছে যাকে বলা হচ্ছে—সুইপার। এই সুইপারের কাজ হবে নিজের দুই উইংব্যাক এবং দুই স্টপারের দিকে নজর রাখা। এই চারজন ডিফেন্ডারের ভিতর কোন একজন পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শূন্যস্থান সুইপারকে পূরণ করতে হবে এবং আক্রমণের সময় এগিয়ে গিয়ে অতর্কিতে বিপক্ষের গোলে হানাও দিতে হবে।

গত বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীকে ঘায়েল করতে যে পোড়ামাটিনীতির আশ্রয় নিয়েছিল, তার সফল প্রয়োগ যে ফুটবল মাঠেও সম্ভব তা প্রমাণ করলেন কোচ হেলেনিও হেরেরা। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার পোড়ামাটি নীতিটা কী?

পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলোকে রাতারাতি খতম করে জার্মান বাহিনী যখন সোভিয়েটের দরজায় ঘা দিল—তখন সোভিয়েট সীমান্ত প্রায় ফাঁকা। মাইলের পর মাইল ক্ষেত-খামার, গ্রাম-শহর পেরিয়ে জার্মান বাহিনী দুর্বার গতিতে যখন মস্কোর দিকে ছুটে চলল, তাদের বাধা দেবার জন্য তখনও কেউ কোথাও ছিল না। নিজেদের ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার ও শস্যের গোলা পুড়িয়ে রাশিয়ানরা একদম পিছনে হটে গেছে। মস্কোর দরজায় এসে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হল জার্মান বাহিনীকে। আর সে দাঁড়ানো দীর্ঘ দিনের জন্য। ক্রমে এসে পড়ল রাশিয়ার প্রসিদ্ধ ভল্লুকে শীত। নদীর জল যখন জমে বরফ হয়, ঝোড়ো হাওয়া দেয় পাঁজরের হাড় ঠকঠকিয়ে। শীত, নিঃশেষিত রসদ, তার উপর রাশিয়ানদের প্রতি-আক্রমণের তীব্রতা। কাজেই পিছু হটতে হল জার্মান বাহিনীকে। কিন্তু পিছু হটে সে দাঁড়াবে কোথায়? আর একটা যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলবে সে জায়গা ত পুড়ে ছারখার। তার উপর পালানোর রাস্তায় হাঁটুভর কাদা—যাতে নড়াচড়া অসম্ভব। কাঁধ ঝুলে পড়া, পিছু-হটা জার্মান সেনারা দেখল তাদের সব আশ্রয়গুলোই রাশিয়ানরা দিয়েছে পুড়িয়ে, খাদ্য-শস্য বলতে একটি দানাও তারা রেখে যায়নি। এতক্ষণে জার্মান সমর-অধিনায়করা বুঝল, নিজের ঘর না বেঁধে হুড়মুড়িয়ে শত্রুর ঘরে ঢোকার কি বিপদ! অথচ আশ্চর্য, একটার পর একটা জয়ের সাফল্যে তারা ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করেছিল। নেপোলিয়ানও একদিন এই পোড়ামাটি নীতির ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। তাঁর অজেয় বাহিনীর অবস্থাও বিধ্বস্ত জার্মান বাহিনীর থেকে অন্য কোন রূপ নেয়নি।

১৯৬০ সালে হেলেনিও হেরেরা তখন স্পেনের বার্সিলোনা ক্লাবের কোচ। ইয়োরোপীয়ান কাপের খেলা—বার্সিলোনা বনাম ইংল্যাণ্ডের উলভারহ্যাম্পটন। এ প্রতিযোগিতায়—প্রত্যেক টীমের সঙ্গে দুটো করে ম্যাচ খেলতে হয়। একটা নিজের দেশে, অপরটি বিপক্ষের দেশে। নিজের দেশে উলভারহ্যাম্পটনকে হারাল বার্সিলোনা ৪-১ গোলে। পরবর্তী খেলা ইংল্যাণ্ডে। হেরেরা ভাল করেই জানেন যে, নিজের মাঠে জেতা আর বিপক্ষের মাঠে জেতা এক কথা নয়। আবহাওয়া, মাঠ, দর্শক সব কিছুই প্রতিকূল। সেইসঙ্গে রয়েছে গোলের সংখ্যায়—হারজিতের ফয়সালা। খেলার শুরুতেই ক্ষুধিত নেকড়ের মতই উলভারহ্যাম্পটন বার্সিলোনার টুঁটি চেপে ধরল। এদিকে সাংবাদিকরা খুঁজতে লাগল বার্সিলোনার সেই সব

ফরোয়ার্ডদের যারা আগের ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটনকে চারটে গোল ঠুকেছিল। তারা দেখল, তাদের ভেতর দুজন মাত্র ফরোয়ার্ড খেলছে আর আটজন ডিফেন্ডার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে উলভের আক্রমণ ঠেকাচ্ছে। প্রথমে উলভ আক্রমণ করছিল
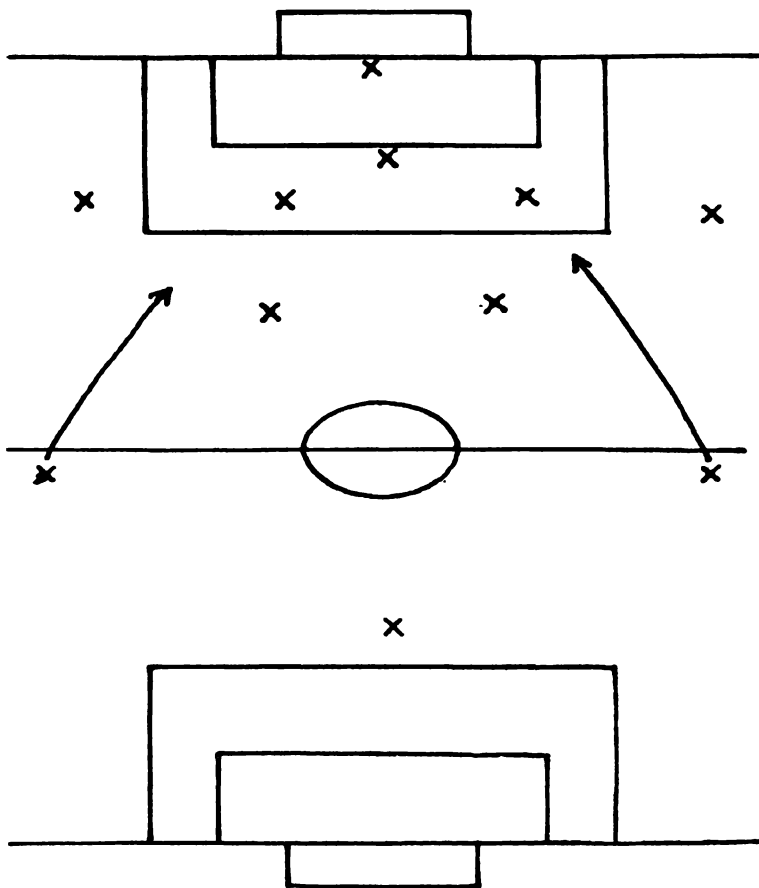
(সাত নম্বর ছবি)

উপরোক্ত ছবিতে 'ক্যাটানেসিও' সিস্টেমের কে কোথায় দাঁড়াবে এবং প্রয়োজনমত কে কোথায় খেলবে তাই দেখানো হয়েছে। এ সিস্টেমে এগিয়ে থাকবে মাত্র তিনজন—বাদবাকী আটজন পুরোপুরি রক্ষণাত্মক খেলবে। এবং বিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে যদি প্রয়োজন হয় দুজন উইংগারও তীরচিহ্নিত জায়গা ধরে পিছনে রক্ষণ কাজে নেমে আসবে। তখন আক্রমণে থাকবে শুধু একটি মাত্র ফরোয়ার্ড। যার ওপর নির্ভর করবে বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে গোল করা। এর জন্যে তাকে কমপ্লীট ফুটবলার হতে হবে। অর্থাৎ নিপুণ ড্রিবলার ও শুটার। দুইজন উইংগার যারা পিছন দিকে নেমে আসবে—তারা আক্রমণের সময় মাঝমাঠ ধরেই বল নিয়ে এগোবে—কেননা এতে তাদের আক্রমণ পরিকল্পনার যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে বলে এবং সেনটার ফরোয়ার্ডের সঙ্গে কাছাকাছি খেলতে পারবে বলেও গোল দিতে বিশেষ সুবিধা হবে।

ছয়জনে। কিন্তু ওতেও কিছু হচ্ছে না দেখে আরও দুজন এগিয়ে নিজেদের ঘর সামলাবার কথা প্রায় যখন ভুলেই গেছে, তখন অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে বার্সিলোনার এগিয়ে থাকা একটি মাত্র ফরোয়ার্ড দলের হয়ে প্রথম গোলটি করে দিল। উলভ্ তখনও সচেতন নয়। তারা আক্রমণের তীব্রতা যত বাড়াতে লাগল তত গোল খেতে লাগল। ক্রমে তারা খেল চারটি গোল। খেলার শেষে উলভের সমর্থকরা যখন আত্মউল্লাসে স্ফীত হয়ে বলতে বলতে ঘরে ফিরল, "আশ্চর্য আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে উলভারহ্যাম্পটন কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের হারিয়ে দিল," হেরেরা তখন নিজেকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, "এইরকমভাবেই ঘটনাটা ঘটুক—এইটাই আমি চেয়েছিলাম।"

সেদিন হেরেরার সাফল্য—ফুটবল-ট্যাকটিকসের ইতিহাসে আর এক নতুন সিস্টেমের জন্ম দিল, যা সবচেয়ে আধুনিক এবং যার নাম ইটালিয়ান ভাষায় 'ক্যাটানেসিও'।

১৯৬০-তে হেরেরা জয়ের জন্য যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, মাত্র চার পাঁচ বছর পরে দুর্বল দলগুলো (বিশেষ করে ইটালিতে) সবল দলের বিপক্ষে, আত্মসম্মান রক্ষার্থে, সেই ছককে অবলম্বন করেই, এমন রক্ষণাত্মক খেলা সুরু করল, যে অধিকাংশ খেলাই শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হতে থাকল। ফুটবলে এই 'বন্ধ্যাত্ব' সব ফুটবল সমালোচককেই ভাবিয়ে তুলল এবং ফুটবলের জনপ্রিয়তা হারাবার আশঙ্কা করে তারা এই ধরনের অতি-রক্ষণাত্মক মনোবৃত্তি ও ক্যাটানেসিও সিস্টেমের বিরূপ সমালোচনা করে অনেক প্রবন্ধও লিখলেন। কিন্তু ক্যাটানেসিও তার প্রয়োজনীয়তা বা জনপ্রিয়তা একবিন্দুও হারাল না। এর কারণ ইটালীর মাঠে 'পরাজয়' মেনে নিতে কেউ রাজী নয়। খেলা সমর্থকদের আনন্দ দিতে পারল কিনা, সেটা গৌণ—মুখ্য হলো প্রিয় দলের জয়। নিদেন পক্ষে ড্র। তা খেলোয়াড়রা যে কোন সিস্টেমেই খেলুক। কোটি কোটি লিরা খরচ করে যে সমস্ত ধনী ইটালীয়ান ক্লাবগুলি বিশ্বের নানান দেশ থেকে রথী-মহারথী ফরোয়ার্ড কিনে আনছে, তাদের কাছে এই সমস্যাটা তেমন প্রবল নয়। কেননা এইসব কৃতী ফুটবলারেরা তাদের চাকরী বাঁচাতে গোল করবেই। কিন্তু যেসব গরীব ক্লাবগুলোর লিরা নেই দেশ-বিদেশ থেকে ফুটবলার আমদানি করবার—অথচ উগ্র সমর্থক আছে যারা তাদের ক্লাবের পরাজয় কিছুতেই মানতে রাজী নয়, সেইসব টিমের কোচেরা কি করবে? কোন্ ট্যাক্‌টিক্‌স তারা গ্রহণ করবে বা করা উচিত! কাজেই তাদের কাছে এই ক্যাটানেসিওই যদি শেষ ভরসাস্থল হয় তাহলে তাঁদের কি বেশী দোষ দেওয়া যায়?

আসলে সমর্থকদের মানসিকতাই কোন ট্যাক্‌টিক্‌সকে কোন দেশে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম।

এই কলকাতার গড়ের মাঠেও, বড় বড় টিমগুলোর বিপক্ষে কিছু কিছু ছোট টিমের খেলোয়াড়দের দেখা যায় যে তারা সবাই মিলে নিজেদের ব্যাক-এরিয়ায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষকে গোল না করতে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছে। এই কাজে সময় সময় তারা সবল প্রতিপক্ষের কাছ থেকে (লীগ ম্যাচে) দুর্মূল্য একটি অথবা দুটি পয়েণ্ট ছিনিয়ে নিতে সক্ষমও হয়।

প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের সাধ্য অনুসারে কৌশল প্রয়োগই—ট্যাক্‌টিক্‌সে সফল হওয়ার মূল মন্ত্র। তাই কে কোন সিস্টেমে খেলবে—তা নির্দিষ্ট করে বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে ফুটবলার, তা যে কোন সিস্টেমেই সে খেলুক না কেন,

এ খেলার মূল উদ্দেশ্যটা তাকে সব সময় স্মরণ রাখতেই হবে— "Goals are the salt of soccer life. The more goals scored, the more positive is the soccer produced; and the spectacle becomes. More spectators are attracted, and induced to grow enthusiastic, more youngsters are inspired, and the more is the game enjoyed by the players."—Willy Meisel.

অর্থাৎ—গোল ফুটবল-জীবনে নুনের মতন। যত গোল হবে, খেলা তত প্রত্যক্ষ ও অসাধারণ দর্শনীয় হয়ে উঠবে। যত দর্শক আকর্ষিত হয়ে মাঠে আসবে এবং তাদের উৎসাহ বাড়ার দিকে যাবে—ততই নবীনরা উদ্বুদ্ধ হবে, এবং খেলোয়াড়রাও খেলাকে আরও উপভোগ করবে।

—উইলি মিজেল

প্রত্যেক ফুটবলারেরই ফুটবল খেলার আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা একান্তই দরকার। আইনের সুযোগগুলো না নিতে পারলে যেমন সার্থক ফুটবলার হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি আইনে রেফারীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে ফুটবলার অবহিত থাকলে, বাদানুবাদ অনেক কমে গিয়ে, খেলা সুষ্ঠুভাবে শেষ হতে পারবে।

১৩০ গজ থেকে ১০০ গজ লম্বায়, ও ১০০ গজ থেকে ৫০ গজ চওড়ার ভিতর যে কোন মাপের হলেই—সে মাঠে ফুটবল খেলা চলবে। তবে মাঠের লম্বা দিকটা, সব সময় চওড়ার চেয়ে বড় হওয়া চাই। ভারতীয় ফুটবল সংস্থা ১১৫×৭৫ গজের মাঠ আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের জন্য অনুমোদন করায়, ঐ মাপের মাঠেই আমাদের ফুটবলারদের খেলা উচিত।

ফুটবলের পরিধি ২৭ থেকে ২৮ ইঞ্চি এবং ওজন (খেলার আগে) ১৪ থেকে ১৬ আউন্স অর্থাৎ ৩৯৬ থেকে ৪৫৩ গ্রামের ভিতর হওয়া চাই। অত্যধিক অথবা কম হাওয়া যেন বলে ভরা না হয়। হাওয়া ভরার পর, বলকে মাথার উপর থেকে মাটিতে ছেড়ে দিলে, বল যদি কোমড় বরাবর ওঠে তাহলে বুঝতে হবে বলে ঠিকমত হাওয়া ভরা হয়েছে। খেলা চলাকালীন একমাত্র রেফারীই বল পাল্টাতে পারেন।

গোলকীপারকে এমন রঙের জামা পড়তে হবে, যার দ্বারা অন্য খেলোয়াড়দের চেয়ে তাকে আলাদা করে চেনা যায়।

খেলার সময় ফুটবলারের এমন কিছু পরা উচিত নয় (যেমন আঙটি, লোহার বালা বা কবজ) যার দ্বারা অপর ফুটবলারের চোট লাগবার সম্ভাবনা রয়েছে।

খেলতে যাবার আগে ফুটবলারকে নিজের বুটের ষ্টাডের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। চামড়া, রাবার, এলুমিনিয়াম, প্লাষ্টিক অথবা ঐ জাতীয় ধাতুর তৈরী ষ্টাডই বুটে ব্যবহার করা যেতে পারে; কিন্তু ষ্টাডের আকৃতি গোল হওয়া চাই ও তার পরিধি ½″ ইঞ্চির চেয়ে কম এবং লম্বায় ¾″ ইঞ্চির চেয়ে যেন বড় না হয়। ষ্টাডে পেরেক বেরিয়ে থাকলে রেফারী সেই ফুটবলারকে খেলতেই দেবেন না।

বল অথবা খেলোয়াড়কে স্পষ্ট করে চেনবার জন্য আলোর অভাব, বল জলে ভাসা, মাঠে চুনের দাগ না থাকা বা অস্পষ্ট এবং ভাঙা গোলপোষ্ট—এই জাতীয় কারণগুলোর ভিতর যে কোন একটির জন্যই ফুটবলার খেলা 'পরিত্যক্ত' বলে ঘোষণা করাবার জন্য রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

কোনও দলের পক্ষে এগারোজন ফুটবলার নিয়ে মাঠে নামা সম্ভব না হলে, কম পক্ষে সাতজন খেলোয়াড়কে নিয়ে নামতে পারলেই রেফারী খেলা সুরু করতে পারবেন। গোলকীপার ছাড়া কোনও টিমেরই খেলবার যোগ্যতা নেই।

রেফারীর বাঁশী বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু খেলা সুরু হয় না। আক্রমণকারী সামনের দিকে বল কিক্ করলে, এবং সেই বল তার পরিধি ২৭″ নিয়ে

একবার বিপক্ষের দিকে পুরোপুরি গড়ালে, তবেই খেলা সুরু হওয়ার মুহূর্ত গণনা করা হয়। এবং এর আগে পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড় মাঠের মধ্য লাইন পার হয়ে বিপক্ষের দিকে পদক্ষেপ করতে পারবে না।

সম্পূর্ণ বলটা টাচ্ লাইন অথবা গোল লাইন অতিক্রম করলে তবেই খেলা বন্ধ হবে। বলের কিছু অংশও যদি লাইনের উপর থাকে তাহলে খেলা চলছে বলেই ধরে নিতে হবে। এই বিষয়ে লাইনসম্যানের ফ্ল্যাগের দিকে না চেয়ে, সর্বদা রেফারীর বাঁশির দিকেই কানকে সজাগ রাখো। কেননা খেলায় সিদ্ধান্ত নেবার ও দেবার অধিকার একমাত্র রেফারীরই—লাইনসম্যানের কাজ রেফারীকে সাহায্য করা।

নীচের নয়টা আইনই খুব দরকারী এবং প্রত্যেক ফুটবলার যতক্ষণ পর্যন্ত না এসবগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছে—ততক্ষণ তাকে চেষ্টা করে যেতে হবে।

(ক) খেলার সময় তোমাকে যদি বিপক্ষের কেউ আঘাত করে, তাহলে কোন সময়েই তাকে প্রত্যাঘাত কোরো না, কেননা এর জন্য রেফারী তোমাকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার আদেশ দেবেন।

(খ) মনে রাখবে বিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া কখনও দুর্ঘটনা নয়, এটা সর্বদাই ইচ্ছাকৃত।

(গ) বিপক্ষের কোন খেলোয়াড়ের হাতে বল লাগলেই 'হ্যাণ্ডবলের' জন্য রেফারীর কাছে আবেদন জানিও না। এ বিষয়ে রেফারী তাঁর বুদ্ধিমত কাজ করবেন। মনে কর তুমি 'হ্যাণ্ডবলের' আবেদন জানালে কিন্তু রেফারী সেই হাতে লাগাটা খেলোয়াড়ের 'অনিচ্ছাকৃত' বলে হ্যাণ্ডবল দিলেন না—তখন তুমি ও তোমার দলই অসুবিধায় পড়বে।

(ঘ) মেজাজ সব সময় শান্ত রাখ—বিপক্ষ চার্জ করলে রেগে যেও না।

(ঙ) বিপক্ষের ন্যায্য চার্জিংএ মাটিতে পড়ে গেলে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। বরং এইটাই তোমাকে খুব দামী শিক্ষা দেবে যে তোমার চার্জিংও যেন ঐরকম ন্যায্য হয়।

বিপক্ষের খেলোয়াড় যদি ইচ্ছাকৃতভাবেও তোমাকে আড়াল করতে থাকে, তাহলে তোমার কোন অধিকার নেই তাকে এমনভাবে ধাক্কা মারা বা চার্জ করা, যার দ্বারা তার শরীরে চোট্ লাগতে পারে।

(চ) রেফারীর সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই প্রত্যেক ফুটবলারকে মাঠে নামতে হবে। রেফারীর কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্য মত পোষণ করলে ফুটবলার নম্রভাবে এবং ভদ্রভাষায় রেফারীর কাছে আবেদন জানাতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাবার জন্য জোড় করে রেফারীকে কিছু বলতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে ফুটবলারের বিশেষ করে জেনে রাখা উচিত যে, রেফারীর প্রতি অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করলে রেফারী সেই খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বার করে দিতে পারেন। এর ফলে একজন কমে গিয়ে সেই ফুটবলারের দলটি যে দুর্বল হয়ে পড়বে শুধু তাই নয়, সেই ফুটবলার বেশ কিছু দিনের জন্য খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিতও হতে পারে।

তাই রেফারীর সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি মেনে নাও। এ নিয়ে খেলোয়াড়দের ভিতর তর্ক-বিতর্ক সুরু হলে সর্বদা রেফারীকেই সাহায্য কর।

মাঠের বাইরে ফুটবলার কর্তৃক অভদ্র ব্যবহারও মাঠের ভিতর সংঘটিত হয়েছে

বলেই ধরা হবে।

শরীরে অল্প আঘাত লাগলে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা কোরো না। আঘাত গুরুতর হলে রেফারী নিজেই লক্ষ্য করবেন।

(ছ) গোলপোষ্টের সামনে চুনের দাগ দেওয়া ছোট চতুষ্কোণ জায়গাটিকে বলা হয়—গোল এরিয়া। গোলকীপারকে স্মরণ রাখতে হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বল হাতে রেখে কালক্ষেপ অথবা বিপক্ষের গতিরোধ করছে—ততক্ষণ আইন তাকে রক্ষা করবে। গোলকীপার সোজাসুজি গোল এরিয়ার বাইরে গেলে—বিপক্ষের যে কেউ তাকে চার্জ করতে পারে।

(জ) গোলকীপারের হাতে বল, অথবা সে যখন বল কিক্ করছে তখন বিপক্ষের সেই বল কিক্ করা বা তার চেষ্টা করাও 'বিপজ্জনক' খেলা। এর জন্য রেফারী ইনডাইরেক্ট ফ্রী কিক্ দেবেন।

গোলকীপার বল হাত দিয়ে ধরে, বল ড্রপ দিতে দিতে অথবা শূন্যে বল ছুঁড়ে এবং তাকে আবার ধরে (যতক্ষণ না সে বল ছাড়ছে এবং সেই বল অন্য খেলোয়াড় স্পর্শ করছে—ততক্ষণ পর্যন্ত) চারটি পদক্ষেপের বেশী যেতে পারবে না।

গোলকীপার জায়গা কভার করবার মানসে পদক্ষেপ নিয়ে বা না নিয়ে, হাত বা পা দিয়ে বল গড়িয়ে দিতে পারে এবং সেই বল আবার হাত দিয়ে তুলে কিক্ও করতে পারে। তবে গোলকীপারের হাত দিয়ে বল ধরা থেকে—কিক্ নেবার সময় পর্যন্ত সে সবশুদ্ধ চারটি পদক্ষেপেরই সুযোগ পাবে—(যতক্ষণ না বল ছাড়া হচ্ছে ও সেই বল অন্য খেলোয়াড় স্পর্শ করবে) খালি মাঝের বল গড়ানোর সময়টুকুতে গোলকীপারের পদক্ষেপ রেফারী গণনা করবেন না।

গোলকীপার পা দিয়ে বল ড্রিবল করতে পারে, এবং এ সময়ে যত ইচ্ছে সে পদক্ষেপও করতে পারে।

(ঝ) একমাত্র আহত হলেই, খেলা চলাকালীন ফুটবলার রেফারীর অনুমতি ব্যতীত খেলার মাঠ ছাড়তে পারে।

যদি কোন খেলোয়াড় খেলা সুরু হবার পর খেলায় যোগদান করতে চায়—তাহলে টাচ্ লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়কে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, এবং রেফারীর অনুমতি-সূচক নির্দেশ পেলে তবেই সে মাঠে ঢুকতে পারে। মাঠ ছেড়ে বেড়োতে গেলেও খেলোয়াড়কে রেফারীর অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ফ্রী কিকের সময় প্রতিরক্ষাকারীর খেলোয়াড়দের বল থেকে দশ গজ দূরে দাঁড়াতে হবে। যদি গোল লাইন থেকে দশ গজেরও কম জায়গায় ফ্রি কিক্ নেওয়া হয়—তাহলে প্রতিরক্ষাকারীর খেলোয়াড়রা গোল লাইনের উপর দাঁড়াতে পারে।

টাচ্ লাইনের যে জায়গা দিয়ে বল মাঠের বাইরে গেছে—ঠিক সেই জায়গার এক গজের ভিতর থেকে ফুটবলারকে থ্রো-ইনের সময় থ্রো করতে হবে।

পেনাল্টি কিকের সময় গোলকীপার এবং যে পেনাল্টি কিক্ করবে—এই দুইজন খেলোয়াড় ছাড়া বাকী খেলোয়াড়দের পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে ও মাঠের ভিতরে যেখানে খুশী দাঁড়াতে পারে।

পেনাল্টি কিক্ নেবার আগে পর্যন্ত গোলকীপার যেমন তার জায়গা থেকে নড়তে পারবে না, তেমনি কোনও খেলোয়াড়ও পেনাল্টি এরিয়ার ভিতর ঢুকে পরতে পারবে না। এ জাতীয় অপরাধ বার বার হলে রেফারী সেই খেলোয়াড়টিকে মাঠ থেকে বার করে দেবেন।

পেনাল্টি কিক্ সবসময় সামনের দিকে নিতে হবে।

পেনাল্টি কিক্ থেকে গোল হলে—রেফারী প্রতিরক্ষাকারীর অন্য কোন রকমের আইনভঙ্গের অজুহাতে, সে গোল নাকচ করবেন না।

তিনদিন খেলার পরও কোনও পক্ষ জিততে না পারলে—রেফারী সেই খেলার ফয়সালা করার জন্য উভয় দলকেই পাঁচটি পেনাল্টি কিক্ করবার সুযোগ দেবেন, এবং প্রত্যেক দলের পাঁচজন খেলোয়াড়কে এই পাঁচটি পেনাল্টি (অর্থাৎ প্রত্যেকে একটি) কিক্ করতে হবে। দলের গোলকীপার এবং পাঁচজন যারা পেনাল্টি কিক্ করবে তারা ছাড়া বাকী সব খেলোয়াড়কেই এই সময় মাঝ-মাঠের বৃত্তের ভিতর থাকতে হবে। এই পেনাল্টি কিকের সুযোগ একই দলের পাঁচটি খেলোয়াড় পর পর পাবে না—উভয় দলের খেলোয়াড়দের পর্যায়ক্রমে নিতে হবে।

পেনাল্টি কিকের পর বল বিপক্ষের গোলকীপারকে স্পর্শ করে এলে আক্রমণকারীর যে কোন খেলোয়াড় সেই বল আবার ছুঁতে পারবে, কিন্তু পেনাল্টি কিক্ যদি গোলপোষ্টে লেগে ফিরে আসে, তাহলে যে পেনাল্টি কিক্ করেছে, সে ছাড়া, দলের বাকী খেলোয়াড়রা সেই বল ছুঁতে পারবে।

অফ-সাইড

ফুটবল খেলার আইনগুলি অফ-সাইডের দুই-একটি নিয়ম ছাড়া মোটামুটি সহজ। এ খেলার প্রচণ্ড গতিশীলতার জন্য—অফ সাইডের বিচার করা খেলোয়াড়ের নিজের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এমন কি রেফারী যদি বল ও খেলোয়াড়ের একই লাইনে উপস্থিত না থাকতে পারেন, তার পক্ষেও এই অফ সাইডের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া দুরূহ। তাই লাইনসম্যানের পক্ষে বল ও খেলোয়াড়কে একই সংগে অনুসরণ করা সহজ ও সম্ভব বলে—রেফারী অফ-সাইডের ব্যাপারে লাইনসম্যানের সিদ্ধান্তের উপরই সবিশেষ নির্ভরশীল।

ফুটবলারের মধ্যমাঠ অতিক্রম করে, বিপক্ষের দিকে পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত অফ-সাইডের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

•নিজ দলের খেলোয়াড় যখন বল কিক্ করছে—তখন ফুটবলার যদি সেই বলের আগে না থাকে, ও বিপক্ষ গোল-লাইনের থেকে ফুটবলারের মাঝখানে বিপক্ষের দুইজন খেলোয়াড় যদি থাকে, তাহলে সেই ফুটবলার অফ-সাইড হবে না।

এছাড়া শেষ মুহূর্তে বল বিপক্ষকে ছুঁলে অথবা বল বিপক্ষের দ্বারা খেলা হলে, গোল কিক্, কর্ণার কিক্, থ্রো-ইন অথবা রেফারী কর্তৃক বল ড্রপ দেবার সময় অফ-সাইড ধরা হয় না।

অফ সাইড পোজিসনে থাকলে ফুটবলার নিজেকে অন-সাইড পোজিসনে আনতে পারবে না বা আনলেও অফ-সাইড হবে। এই অফ-সাইডের হাত থেকে ফুটবলার কেবল বাঁচতে পারে—যদি বিপক্ষ বলকে স্পর্শ করে, স্বখেলোয়াড়ের পায়ে বল থাকার সময় ফুটবলার বলের আগে না থাকে, অথবা ইতিমধ্যে বিপক্ষ-গোল লাইন থেকে ফুটবলারের মাঝখানে বিপক্ষের দুইজন খেলোয়াড় এসে পড়ে।
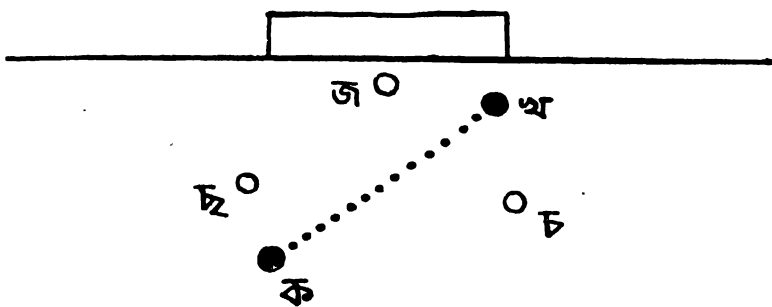
(এক নম্বর)

ক বিপক্ষের চ এবং ছ-এর ভিতর দিয়ে নিজের খেলোয়াড় খ-কে বল পাস করেছে। কিন্তু বিপক্ষের টাচ্ লাইন থেকে খ-এর ভিতর বিপক্ষের দুইজন খেলোয়াড় না থাকায়—খ অফ সাইড।
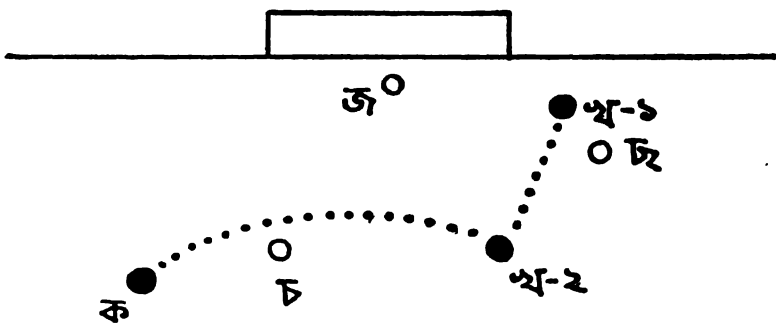
(দুই নম্বর)

ক এখানে বল সেণ্টার করেছে। খ-১ সেই বল খ-২-এর জায়গায় এসে ট্র্যাপ করেছে। রেফারী এক্ষেত্রে খ-এর অফ সাইড দেবেন। কেননা ক যখন বল কিক্ করেছে খ তখন অফ সাইডেই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পরে অফসাইড থেকে খ-২-এর জায়গায় অর্থাৎ অন সাইডে এসেছে।
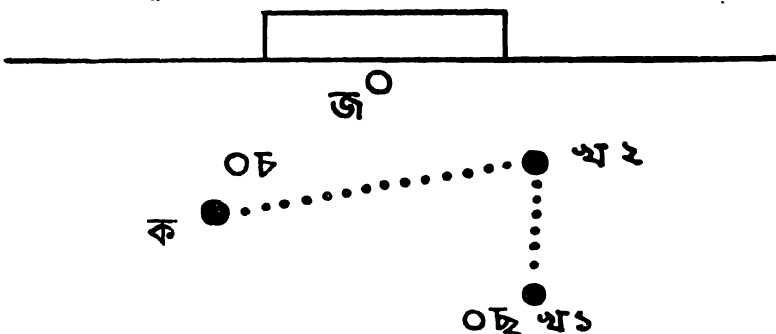
(তিন নম্বর)

সামনে বিপক্ষের চ থাকায় ক খ-২-এর জায়গায় বল পাস করেছে। খ খ-১-এর জায়গা থেকে ছুটে গিয়ে খ-২-এর জায়গায় পেঁাছে সেই বল ধরেছে। খ কিন্তু এখানে অফ সাইড নয়, কেননা ক যখন বল পাস করেছে খ-১ তখন বলের আগে ছিল না।
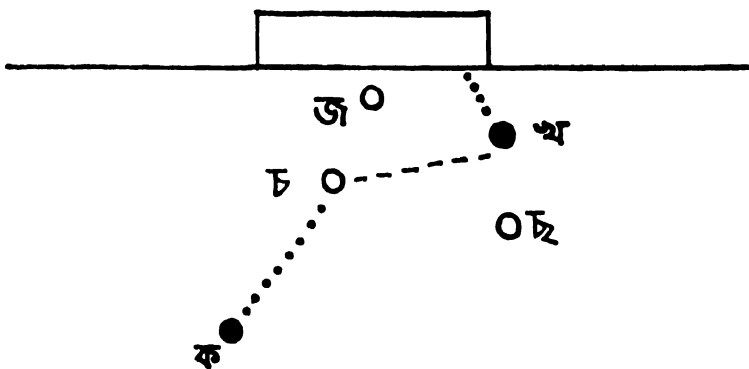
(চার নম্বর)

ক গোলে শট্ নিয়েছে। কিন্তু সেই বল বিপক্ষের চ-এর গায়ে লেগে স্বপক্ষের খ-এর কাছে চলে গেছে এবং খ সেই বল নিয়ে গোল করেছে। খ—যদিও এখানে বলের সামনে আছে এবং বিপক্ষ টাচ্ লাইন থেকে তার সামনে বিপক্ষের দুইজন খেলোয়াড় না থাকায় খ অফ সাইড হতে পারত কিন্তু শেষ মুহূর্তে বল বিপক্ষ চ-এর গায়ে লাগায় খ অফ সাইড হবে না।
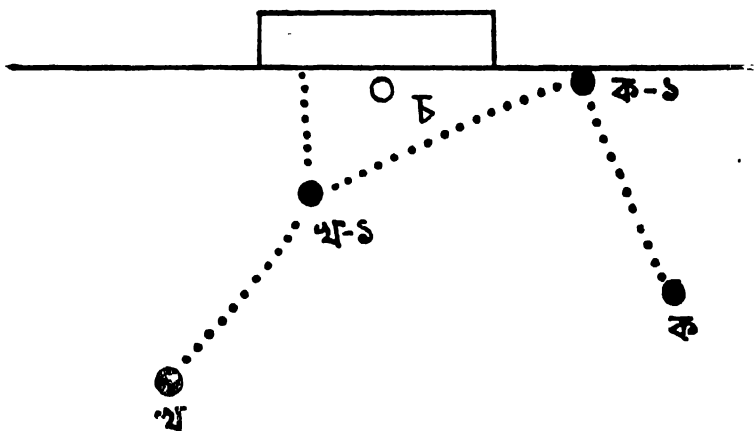
(পাঁচ নম্বর)

ক বল নিয়ে ক-১-এর জায়গায় পৌঁছে খ-১-এর পোজিশনে ব্যাক-সেণ্টার করেছে এবং খ নিজের জায়গা থেকে ছুটে খ-১-এর জায়গায় পৌঁছে সেই বলকে কিক্ করে গোল করেছে। যেহেতু খ এখানে বলের পিছনে ছিল—সেইহেতু খ-এর এখানে অফ সাইড হবে না।

সমাপ্ত